জেন্ডারকোষ

নিশাত জাহান রানা

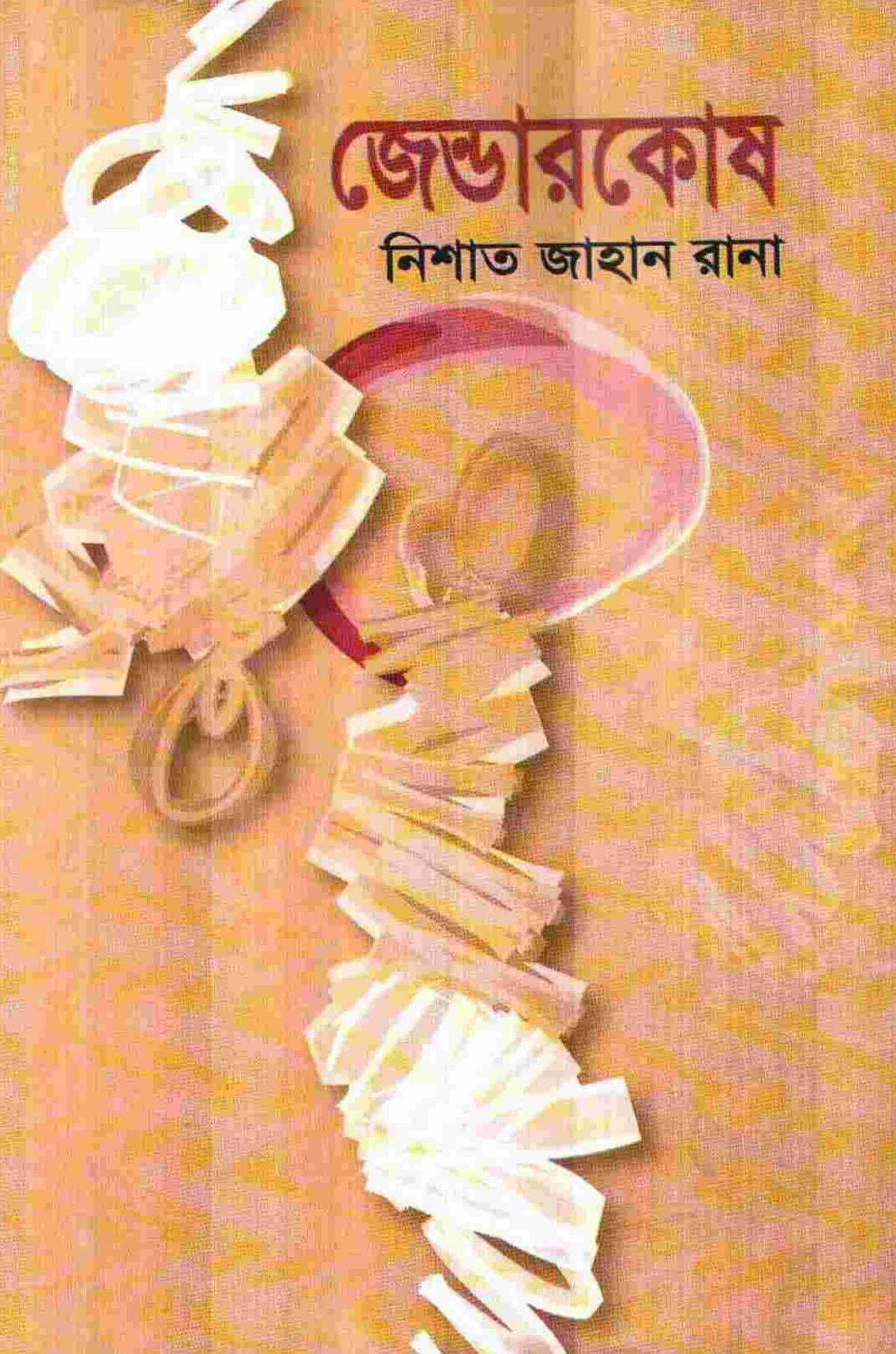

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
নিশাত জাহান রানা

উপদেষ্টামণ্ডলি

অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী
উইমেন স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপকরণ সহযোগী
মাহবুবা হক কুমকুম
ও
ফাহমিদা হক

প্রদায়ক
অদিতি ফাল্গুনী

মুখবন্ধ

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মেরি ওলসটোনক্রাফট *A vindication of the rights of woman* লিখে বড় রকম বিতর্কের সূচনা করেছিলেন। নারীর অধিকার কথাটাই তখন নতুন শুনিয়েছিল। বিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যজগতে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তা সফল হয়। তবে শতাব্দীর শেষার্ধে নারীবাদ ও নারীবাদী আন্দোলন সারা পৃথিবীতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। দীর্ঘকালের পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষপ্রধান সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ, আচার ও সংস্কার তখন বড় রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। নারীর দৈহিক গড়ন আলাদা, শুধু এই কথা বলে, তার জন্য এক ধরনের কাজকর্ম নির্দিষ্ট করা কিংবা অন্য আরেক ধরনের কাজকর্ম থেকে তাকে নিবৃত্ত করার প্রবণতা যুক্তিতর্কের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এমন কি, নারী কী ভাবে, কেমন করে অনুভব করে, কী চিন্তা করে, কেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তা জানাবার ও রচনা করার অধিকারও নারী কেড়ে নিতে চাইল পুরুষের কাছ থেকে, সৃষ্টি করল নারীবাদী সাহিত্য।

নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক বৈষম্য, নারীর বৈশিষ্ট্য এবং নারীবাদী ভাবনাচিন্তার পরিচয় দিয়ে নিশাত জাহান রানা *জেন্ডারকোষ* নামে যে বই লিখেছেন, তার তুল্য কিছু বাংলাভাষায় আমার চোখে পড়ে নি। বইটি রচিত হয়েছে অভিধানের আদলে। এর ভুক্তিসকলের নির্বাচন সুচিন্তিত এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সুলিখিত। নারী সম্পর্কে এখন আমাদের দেশে যেসব পাঠ, আলোচনা ও গবেষণা হচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রেই বইটি কাজে আসবে। আমি রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা করি এবং আশা করি, এ বই পাঠকসাধারণের সমাদর লাভ করবে।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
১৮. ০৪. ০২

প্রাক্‌কথন

বিশ্বব্যাপী নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনায় এলেও কার্যক্ষেত্রে এই সাম্য সফল করে তোলা যে খুব সহজ নয় বিভিন্ন সময় নানান পদক্ষেপ গ্রহণ ও সেসব ক্রমাগত পুনর্বিবেচনার ভেতর দিয়ে তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণের (Gender Mainstreaming) উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন ধারণা হিসেবে 'জেন্ডার' খুব নতুন না হলেও এবং 'নারীর সমানাধিকার' একটি প্রবল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ক তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে প্রধানতই বাইরের জগৎ থেকে। যে কারণে জেন্ডার ও এ-সংক্রান্ত শব্দমালা ভাষাগত এবং কখনও কখনও পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত কারণে সকলের কাছে সমানভাবে স্পষ্ট হয় না বরং অনেক শব্দই সাধারণভাবে আমাদের কাছে ভিন্ন অর্থপ্রবাহ আনয়ণ করে। অথচ নারীর সমানাধিকারসহ সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে জেন্ডারসংক্রান্ত ধারণাসমূহ অনুধাবন বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে বিষয়টি ব্যাপকভাবে জানার আগ্রহও নানামহলে সৃষ্টি হয়েছে। উন্নয়নকর্মী ছাড়াও সাধারণ সকল পাঠকের আগ্রহের ব্যাপারটি বিবেচনায় রেখেই যতখানি সম্ভব সহজবোধ্য করে বিষয়টি এই বইয়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণের উদ্যোগের ফলে বিষয়টির ব্যাপকতা বিশাল আকার ধারণ করেছে। তবে বইয়ের কলেবর এবং সাধারণ পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করে এই কোষ রচনায় শব্দচয়নের ক্ষেত্রে 'জেন্ডার' শব্দটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বা এ সম্বন্ধীয় ধারণাসমূহ অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক শব্দগুলিই গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ধারণাসমূহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ধারণা ও ব্যাখ্যাসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে ভাব সংকলন করা হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে গৃহীত যেসব সংজ্ঞা সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূলানুগ ভাবানুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। সবসময় যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে না পাওয়ায় আমরা কিছু শব্দ ভাবানুসারে তৈরির চেষ্টা করেছি এবং যে সকল ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দটি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিচিত, সর্বোপরি যথার্থ বাংলা সমার্থক শব্দ এখনও অনায়ত্ত সে ক্ষেত্রে নতুন

শব্দ তৈরির পরিবর্তে তা ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে; যেমন : জেন্ডার। Gender-এর বাংলা হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'জেন্ডার' এবং কখনও কখনও 'লিঙ্গ' গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধারণাগত নৈকট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। Sex-কেন্দ্রিক ধারণাসমূহের ক্ষেত্রেই 'লিঙ্গ/লৈঙ্গিক' ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু এই বইয়ের উদ্দেশ্য সমার্থক বাংলা শব্দ নির্মাণ করা নয় বরং ধারণাগত ব্যাখ্যা প্রদান- সেদিক থেকে বিবেচনা করে পাঠকবৃন্দ যদি কোন ক্ষেত্রে যথাযথ বাংলা সমার্থক শব্দ প্রস্তাব করেন- তাহলে অত্যন্ত খুশি হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

এই জেন্ডার কোষটির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ পাঠ করে অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অত্যন্ত সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করেছেন। প্রচণ্ড ব্যস্ততার ভেতরেও তাঁরা যে তাঁদের মূল্যবান সময় এই বইয়ের সার্বিক সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছেন, সেজন্য আমি উভয়ের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

তথ্য সংগ্রহ ও উপকরণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মাহবুবা হক কুমকুম, ফাহমিদা হক এবং শেষপর্যায়ে অদিতি ফাল্গুনী যে আন্তরিক শ্রম দান করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

জেন্ডারকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

নিশাত জাহান রানা
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

Authority ১৭
Body image ১৭
Body politics ১৮
Capitalism ১৯
Class ১৯
Conditioning ২১
Empowerment ২১
Female ২৩
Feminine ২৩
Feminism ২৪
Feminist ২৮
Gender ৩১
Gender Analysis ৩৩
Gender Analysis Framework ৩৪
Gender and Communication ৩৬
Gender and Conflict ৩৭
Gender and Culture ৩৭
Gender and Development (GAD) ৩৯
Gender and Economics ৪০
Gender and Environment ৪৩
Gender and Generation ৪৪
Gender Audit ৪৫
Gender Awareness ৪৬
Gender Balance ৪৭
Gender Bias ৪৮
Gender Blind ৪৮
Gender Desegregation of Data ৪৯
Gender Discrimination ৪৯
Gender Equality ৫০
Gender Equity ৫০

Gender in Development Programme (GIDP) & History of Gender & Development ৫১
Gender Mainstreaming ৫৬
Gender Need ৫৮
Gender Neutral ৫৯
Gender Oppression ৫৯
Gender Perspective ৫৯
Gender Planning ৫৯
Gender Relation ৬০
Gender Role ৬১
Gender Sensitive ৬২
Gender Sensitive Appraisal ৬৩
Gender Skill/ Competency ৬৩
Gender Specific ৬৩
Gender Subordination ৬৩
Gender-related Development Index (GDI) ৬৫
Gendering ৬৫
Genderising ৬৬
History of Gender Relation ৬৬
Lesbian ৬৭
Male ৬৮
Male Chauvinist ৬৮
Masculine ৬৮
Matriarchal ৬৯
Matrifocal ৬৮
Matrilineal ৬৯
Patriarchy ৬৯
Position of Woman and Man ৬৯
Power Relation of Gender ৭০
Rape ৭১

Reproduction/Production ৭৩
Sex ৭৩
Sexism ৭৫
Sexual Division of Labour ৭৫
Sexual Harassment ৭৫
Socialization Process ৭৭
Son Preference ৭৮
Stereotyping ৭৮
Violence Against Women ৭৮
Women and Development - WAD ৭৯
Women in Development - WID ৭৯

অভ্যস্ত হওয়া ২১
উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার এবং ৫১
জেন্ডার ও উন্নয়নের ইতিহাস
উন্নয়নে নারী ৭৯
কর্তৃত্ব ১৭
ক্ষমতায়ন ২১
গতানুগতিকতা ৭৮
জেন্ডার ৩১
জেন্ডার নিরীক্ষা ৪৫
জেন্ডার ও অর্থনীতি ৪০
জেন্ডার ও উন্নয়ন ৩৯
জেন্ডার ও পরিবেশ ৪৩
জেন্ডার ও প্রজনন ৪৪
জেন্ডার বিশ্লেষণ ৩৩
জেন্ডার বিশ্লেষণী কাঠামো ৩৪
জেন্ডার ও যোগাযোগ ৩৬
জেন্ডার ও সংঘাত ৩৭
জেন্ডার ও সংস্কৃতি ৩৭
জেন্ডার চাহিদা ৫৮
জেন্ডার দক্ষতা ৬৩
জেন্ডার নিরপেক্ষ ৫৯
জেন্ডার নিশ্চেতন ৪৮
জেন্ডার ন্যায়পরতা ৫০
জেন্ডার পরিকল্পনা ৫৯
জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত ৫৯
জেন্ডার ভূমিকা ৬১
জেন্ডার সংবেদী ৬২
জেন্ডার সংবেদী পর্যালোচনা ৬৩
জেন্ডার সচেতনতা ৪৬
জেন্ডার সচেতনতা নির্মাণ ৬৬

জেন্ডার সমতা ৫০
জেন্ডার সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক ৬৫
জেন্ডার/লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ ৪৯
দেহ ভাবমূর্তি ১৭
দেহ রাজনীতি ১৮
ধর্ষণ ৭১
নারী ২৩
নারী ও উন্নয়ন ৭৯
নারী-পুরুষের অবস্থান ৬৯
নারী-পুরুষ বৈষম্য ৪৯
নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণ ৪৮
নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক ৬০
নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস ৬৬
নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কজাত ৭০
ক্ষমতার সম্পর্ক
নারীবাদ ২৪
নারীবাদী ২৮
নারীর প্রতি সন্ত্রাস ৭৮
নারীসুলভ ২৩
পুনরুৎপাদন/উৎপাদন ৭৩
পুত্র-প্রাধান্য ৭৮
পুরুষ ৬৮
পুরুষসুলভ ৬৮
পৌরুষ-অহংকারী ৬৮
পুঁজিবাদ ১৯
পিতৃতন্ত্র ৬৯
মাতৃরৈখিক ৬৯
মাতৃসম্বন্ধীয় ৬৯
মাতৃশাসিত ৬৮
মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ ৫৬
যৌনবাদ ৭৫
যৌন হয়রানি ৭৫

লিঙ্গ/যৌন ৭৩
লিঙ্গ চেতনা নির্মাণ ৬৬
লিঙ্গ-পক্ষপাত ৪৮
লিঙ্গ নির্দিষ্ট ৬৩
লৈঙ্গিক অধিনতা ৬৩
লৈঙ্গিক-নিপীড়ণ ৫৯
সমকামী নারী ৬৭
সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ৭৭
শ্রেণী ১৯
শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন ৭৫

Authority : কর্তৃত্ব

কর্তৃত্ব হলো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বা ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকতা। পুরুষের কর্তৃত্ব অবিসংবাদিতভাবে, সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে থাকে। কেননা এটিই প্রচলিত ধারা। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ক্ষমতা সাধারণত টিকে থাকে পুরুষ-কর্তৃত্বের বলয়ে। যেমন- যদি বলা হয় যে, সংসারের কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে, তার অর্থ দাঁড়ায়, সংসার বা পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সকল সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা পরিবারপ্রধান পুরুষটির হাতে; কিন্তু যদি বলা হয় যে, সংসারের কর্তৃত্ব নারীর হাতে, তার অর্থ, সেই বিশেষ সংসার বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানটিতে পরিবারপ্রধান পুরুষ হলেও সিদ্ধান্তগ্রহণ করে নারী। তবে সেটা ঘটে অনেকাংশেই পুরুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। একইভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিষয়টির ক্রিয়াশীলতা বিচার করা যেতে পারে।

Body Image : দেহ ভাবমূর্তি

সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে দেহ বা শরীর বিষয়ক ব্যক্তিগত মূল্যবোধ। অর্থাৎ সমাজ আমাদের দেহ যেভাবে গ্রহণ করে বা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখে বলে আমরা বিশ্বাস করি সেই বিশ্বাস বা ধারণাটিই হলো দেহ বিষয়ক ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ভিত্তি। নারীদেহের প্রতি সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে আমাদের সমাজের অধিকাংশ নারী নিজ দেহ নিয়ে বিব্রতবোধ করে। অধিকাংশ সমাজে নারীর শরীর কামনা উদ্রেককারী বস্তু হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে অন্যের অর্থাৎ পুরুষের দৃষ্টি থেকে শরীর আড়াল করে রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ বস্ত্রের বোঝা নারীর ওপর চাপিয়ে রাখা হয়। পুরুষের জৈবিক প্রবৃত্তির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ পদ্ধতি বিবেচনার পরিবর্তে নারীকে অর্থাৎ নারীর শরীর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি Body Image বা দেহ ভাবমূর্তি নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

নারীর দেহ ভাবমূর্তি স্থির কোন ধারণা নয়। উৎপাদন ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার সঙ্গে এ ধারণাও বিভিন্ন। যেমন- কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর সমাজে তুলনামূলক স্বাস্থ্যবতী এবং শিল্পভিত্তিক পশ্চিমা সমাজে কৃশকায়া নারীর কদর বেশি।

সাম্প্রতিক সময়ে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে পোশাকের কাঙ্ক্ষিত ঝুল বা দৈর্ঘ্যের এক ইঞ্চি হেরফেরে নারীর ওপর নেমে আসা রাষ্ট্রীয় সহিংসতা দেহ ভাবমূর্তিসংক্রান্ত সামাজিক মনোভাবের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অপর দিকে পশ্চিমা জগতের 'বে ওয়াচ' জাতীয় টিভি সিরিয়ালে নারী শরীরের পণ্যসম

উন্মোচন এই মনোভাবের অপর প্রান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। আরব নারীবাদী হাইদে মোগহিসির ভাষায়, বোরখা ও বিকিনি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দুটোই নারী শরীরের বিষয়ে পুরুষের মনোজাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বপ্রবণের স্বেচ্ছাচারিতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

Body Politics : দেহ রাজনীতি

মানুষের যে শারীরিক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে ক্ষমতার সম্পর্কগুলো ব্যক্ত হয়, দেহ রাজনীতি বলতে প্রাথমিকভাবে তাই বোঝায়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার সমপর্যায়ের একজনের সামনে যে ভঙ্গিতে দাঁড়ায় বা কথা বলে, তার কর্মচারীর সামনে একই ভঙ্গিতে দাঁড়ায় না বা কথা বলে না। অপরদিকে কর্মচারীটির দেহভাষা তার মালিকের সামনে থাকে বিনয়াবনত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। কর্মচারী ব্যক্তিটির দেহভাষা তার অধস্তন অর্থাৎ স্ত্রীর সামনে বদলে যায়; হয়ে ওঠে ঋজু এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। দেহভাষার এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অধস্তন ও অধিপতির সম্পর্ক অর্থাৎ ক্ষমতার সম্পর্ক বিবৃত করে। ক্ষমতা ব্যক্ত করার জন্য শরীরকে মাধ্যম করাকে দেহ রাজনীতি বলে। নারীবাদীদের মতে, পুরুষ যেভাবে নারীর শরীরের ওপর নিজের শরীরের ক্ষমতা খাটায় সেটিই শরীর বা দেহ রাজনীতি। এই ক্ষমতা শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে যা সামগ্রিক বিচারে নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নারীর শরীর নিয়ে সুসংগঠিত পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির সর্বোচ্চ নিয়মতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছে নারীর মাতৃত্ব নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। 'মাতৃত্ব' নারীর গৌরব বলে সমাজ অভিহিত করলেও অবিবাহিত নারীর মাতৃত্ব সমাজ মেনে নেয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর 'মাতৃত্ব' অবরুদ্ধ হয় 'বিয়ে' নামক প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে। নারী স্বেচ্ছায় সন্তানধারণ করতে পারে না। তার জরায়ুর প্রভু হলো পুরুষ। নারী কন্যাসন্তান কামনা করতে পারে না। কোন কোন সমাজে কন্যাশিশু হত্যা, কন্যাশিশুর ভ্রূণহত্যা আজও প্রচলিত। সারা পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পুরুষের তুলনায় নারী ব্যবহার করে বেশি। এভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিপুল দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে নারীর ওপর। কোন কোন ধর্মে বিবাহিত নারীর শরীরে চিহ্ন দিয়ে এক পুরুষের মালিকানা ঘোষণা [illegible] নারীর [illegible] প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, [illegible] নারীকে 'অপূর্ণা' বলে [illegible] নারীর [illegible] পুরুষের জন্য এবং

পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিতে সপত্নীক/বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় বিয়ে করতে পারে। কিন্তু নারী একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে পারে না। কোন কোন সংস্কৃতিতে নারীর যে কোন প্রকার দ্বিতীয় বিয়েই নিষিদ্ধ, কোথাও নিন্দনীয়। নারীর শরীরের ওপর আধিপত্যবাদের চূড়ান্ত নমুনা ধর্ষণ ও তার ভগাঙ্কুর কর্তন ।

নারীর শরীর কেমন হবে- সেটা আবৃত না অনাবৃত হবে, রোগা না মোটা, ফরসা অথবা কালো, পশমযুক্ত অথবা পশমশূন্য, স্বাধীনভাবে গমনাগমনের ক্ষমতাসম্পন্ন অথবা অবরুদ্ধ অথবা শর্তসাপেক্ষে সীমিতভাবে চলাচলের ক্ষমতাসম্পন্ন,এককথায় নারী-শরীরকে ঘিরে পুরুষতন্ত্রের তাবৎ সিদ্ধান্তগ্রহণের এখতিয়ারকে দেহ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা, বিলিয়ন ডলার সৌন্দর্য-ইন্ডাস্ট্রি, ফতোয়া, সহমরণ, লোকগাথা বা ধর্মীয় পুরাণে সতী নারীদের তিতিক্ষার কাহিনী, দেহব্যবসা, গর্ভপাতের অধিকার প্রশ্নে ভ্যাটিকান ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সহাবস্থান ইত্যাদি দেহ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। কবিতা-সঙ্গীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্যে নারীকে যৌন বস্তুর ভূমিকায় চিত্রিত করাও দেহ রাজনীতির বাইরে নয়।

নারীর শরীর নিয়ে নানামাত্রিক রাজনীতির পুরুষতান্ত্রিক লক্ষ্য হলো নারীর ইতিবাচক পরিচিতি (মেধা, দক্ষতা, ক্ষমতা ইত্যাদি) লুপ্ত করে তাকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা।

Capitalism : পুঁজিবাদ

'পুঁজিবাদ' এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ আর শ্রমিক শোষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সমাজে নারীকে বিবেচনা করা হয় পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে এবং নারীকে শোষণ করা হয় নানাভাবে। অধিকাংশ নারীবাদীগণ একমত যে, নারীর নির্যাতন-নিপীড়নের মর্মান্তিক চিত্র যে দেখে নি; সে পুঁজিবাদী সমাজকে বুঝতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে নারী একটি বিশেষ পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Class : শ্রেণী

একটি সমাজে একই অর্থনৈতিক সম্পত্তির ভিত্তিতে একই ধরনের জীবনযাপনের প্রাপ্তিতে যারা অন্তর্ভুক্ত তাদের সমষ্টিকে একটি শ্রেণী বলে। শ্রেণী-পার্থক্যের প্রধান ভিত্তি সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত নৈকট্য।

উন্মোচন এই মনোভাবের অপর প্রান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। আরব নারীবাদী হাইদে মোগহিসির ভাষায়, বোরখা ও বিকিনি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দুটোই নারী শরীরের বিষয়ে পুরুষের মনোজাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বপূরণের স্বেচ্ছাচারিতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

Body Politics : দেহ রাজনীতি

মানুষের যে শারীরিক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে ক্ষমতার সম্পর্কগুলো ব্যক্ত হয়, দেহ রাজনীতি বলতে প্রাথমিকভাবে তাই বোঝায়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার সমপর্যায়ের একজনের সামনে যে ভঙ্গিতে দাঁড়ায় বা কথা বলে, তার কর্মচারীর সামনে একই ভঙ্গিতে দাঁড়ায় না বা কথা বলে না। অপরদিকে কর্মচারীটির দেহভাষা তার মালিকের সামনে থাকে বিনয়াবনত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। কর্মচারী ব্যক্তিটির দেহভাষা তার অধস্তন অর্থাৎ স্ত্রীর সামনে বদলে যায়; হয়ে ওঠে ঋজু এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। দেহভাষার এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অধস্তন ও অধিপতির সম্পর্ক অর্থাৎ ক্ষমতার সম্পর্ক বিবৃত করে। ক্ষমতা ব্যক্ত করার জন্য শরীরকে মাধ্যম করাকে দেহ রাজনীতি বলে। নারীবাদীদের মতে, পুরুষ যেভাবে নারীর শরীরের ওপর নিজের শরীরের ক্ষমতা খাটায় সেটিই শরীর বা দেহ রাজনীতি। এই ক্ষমতা শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে যা সামগ্রিক বিচারে নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নারীর শরীর নিয়ে সুসংগঠিত পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির সর্বোচ্চ নিয়মতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছে নারীর মাতৃত্ব নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। 'মাতৃত্ব' নারীর গৌরব বলে সমাজ অভিহিত করলেও অবিবাহিত নারীর মাতৃত্ব সমাজ মেনে নেয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর 'মাতৃত্ব' অবরুদ্ধ হয় 'বিয়ে' নামক প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে। নারী স্বেচ্ছায় সন্তানধারণ করতে পারে না। তার জরায়ুর প্রভু হলো পুরুষ। নারী কন্যাসন্তান কামনা করতে পারে না। কোন কোন সমাজে কন্যাশিশু হত্যা, কন্যাশিশুর ভ্রূণহত্যা আজও প্রচলিত। সারা পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পুরুষের তুলনায় নারী ব্যবহার করে বেশি। এভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিপুল দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে নারীর ওপর। কোন কোন ধর্মে বিবাহিত নারীর শরীরে চিহ্ন দিয়ে এক পুরুষের মালিকানা ঘোষণা করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। মাসিক চক্র নারীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অথচ কোন কোন সংস্কৃতিতে মাসিক চক্র চলাকালীন নারীকে 'অস্পৃশ্য' বলে গণ্য করা হয়। নারীর শরীর, সজ্জা, পোশাক সকল কিছুই পুরুষের জন্য এবং

পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিতে সপত্নীক/বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় বিয়ে করতে পারে। কিন্তু নারী একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে পারে না। কোন কোন সংস্কৃতিতে নারীর যে কোন প্রকার দ্বিতীয় বিয়েই নিষিদ্ধ, কোথাও নিন্দনীয়। নারীর শরীরের ওপর আধিপত্যবাদের চূড়ান্ত নমুনা ধর্ষণ ও তার ভগাঙ্কুর কর্তন ।

নারীর শরীর কেমন হবে- সেটা আবৃত না অনাবৃত হবে, রোগা না মোটা, ফরসা অথবা কালো, পশমযুক্ত অথবা পশমশূন্য, স্বাধীনভাবে গমনাগমনের ক্ষমতাসম্পন্ন অথবা অবরুদ্ধ অথবা শর্তসাপেক্ষে সীমিতভাবে চলাচলের ক্ষমতাসম্পন্ন,এককথায় নারী-শরীরকে ঘিরে পুরুষতন্ত্রের তাবৎ সিদ্ধান্তগ্রহণের এখতিয়ারকে দেহ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা, বিলিয়ন ডলার সৌন্দর্য-ইন্ডাস্ট্রি, ফতোয়া, সহমরণ, লোকগাথা বা ধর্মীয় পুরাণে সতী নারীদের তিতিক্ষার কাহিনী, দেহব্যবসা, গর্ভপাতের অধিকার প্রশ্নে ভ্যাটিকান ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সহাবস্থান ইত্যাদি দেহ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। কবিতা-সঙ্গীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্যে নারীকে যৌন বস্তুর ভূমিকায় চিত্রিত করাও দেহ রাজনীতির বাইরে নয়।

নারীর শরীর নিয়ে নানামাত্রিক রাজনীতির পুরুষতান্ত্রিক লক্ষ্য হলো নারীর ইতিবাচক পরিচিতি (মেধা, দক্ষতা, ক্ষমতা ইত্যাদি) লুপ্ত করে তাকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা।

Capitalism : পুঁজিবাদ

'পুঁজিবাদ' এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ আর শ্রমিক শোষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সমাজে নারীকে বিবেচনা করা হয় পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে এবং নারীকে শোষণ করা হয় নানাভাবে। অধিকাংশ নারীবাদীগণ একমত যে, নারীর নির্যাতন-নিপীড়নের মর্মান্তিক চিত্র যে দেখে নি; সে পুঁজিবাদী সমাজকে বুঝতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে নারী একটি বিশেষ পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Class : শ্রেণী

একটি সমাজে একই অর্থনৈতিক সম্পত্তির ভিত্তিতে একই ধরনের জীবনযাপনের আওতায় যারা অন্তর্ভুক্ত তাদের সমষ্টিকে একটি শ্রেণী বলে। শ্রেণী-পার্থক্যের প্রধান ভিত্তি সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত নৈকট্য।

উন্মোচন এই মনোভাবের অপর প্রান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। আরব নারীবাদী হাইদে মোগহিসির ভাষায়, বোরখা ও বিকিনি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ দুটোই নারী শরীরের বিষয়ে পুরুষের মনোজাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বপূরণের স্বেচ্ছাচারিতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

Body Politics : দেহ রাজনীতি

মানুষের যে শারীরিক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে ক্ষমতার সম্পর্কগুলো ব্যক্ত হয়, দেহ রাজনীতি বলতে প্রাথমিকভাবে তাই বোঝায়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার সমপর্যায়ের একজনের সামনে যে ভঙ্গিতে দাঁড়ায় বা কথা বলে, তার কর্মচারীর সামনে একই ভঙ্গিতে দাঁড়ায় না বা কথা বলে না। অপরদিকে কর্মচারীটির দেহভাষা তার মালিকের সামনে থাকে বিনয়াবনত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। কর্মচারী ব্যক্তিটির দেহভাষা তার অধস্তন অর্থাৎ স্ত্রীর সামনে বদলে যায়; হয়ে ওঠে ঋজু এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। দেহভাষার এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অধস্তন ও অধিপতির সম্পর্ক অর্থাৎ ক্ষমতার সম্পর্ক বিবৃত করে। ক্ষমতা ব্যক্ত করার জন্য শরীরকে মাধ্যম করাকে দেহ রাজনীতি বলে। নারীবাদীদের মতে, পুরুষ যেভাবে নারীর শরীরের ওপর নিজের শরীরের ক্ষমতা খাটায় সেটিই শরীর বা দেহ রাজনীতি। এই ক্ষমতা শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে যা সামগ্রিক বিচারে নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নারীর শরীর নিয়ে সুসংগঠিত পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির সর্বোচ্চ নিয়মতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছে নারীর মাতৃত্ব নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। 'মাতৃত্ব' নারীর গৌরব বলে সমাজ অভিহিত করলেও অবিবাহিত নারীর মাতৃত্ব সমাজ মেনে নেয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর 'মাতৃত্ব' অবরুদ্ধ হয় 'বিয়ে' নামক প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে। নারী স্বেচ্ছায় সন্তানধারণ করতে পারে না। তার জরায়ুর প্রভু হলো পুরুষ। নারী কন্যাসন্তান কামনা করতে পারে না। কোন কোন সমাজে কন্যাশিশু হত্যা, কন্যাশিশুর ভ্রূণহত্যা আজও প্রচলিত। সারা পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পুরুষের তুলনায় নারী ব্যবহার করে বেশি। এভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিপুল দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে নারীর ওপর। কোন কোন ধর্মে বিবাহিত নারীর শরীরে চিহ্ন দিয়ে এক পুরুষের মালিকানা ঘোষণা করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। মাসিক চক্র নারীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অথচ কোন কোন সংস্কৃতিতে মাসিক চক্র চলাকালীন নারীকে 'অস্পৃশ্য' বলে গণ্য করা হয়। নারীর শরীর, সজ্জা, পোশাক সকল কিছুই পুরুষের জন্য এবং

পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিতে সপত্নীক/বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় বিয়ে করতে পারে। কিন্তু নারী একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে পারে না। কোন কোন সংস্কৃতিতে নারীর যে কোন প্রকার দ্বিতীয় বিয়েই নিষিদ্ধ, কোথাও নিন্দনীয়। নারীর শরীরের ওপর আধিপত্যবাদের চূড়ান্ত নমুনা ধর্ষণ ও তার ভগাঙ্কুর কর্তন ।

নারীর শরীর কেমন হবে- সেটা আবৃত না অনাবৃত হবে, রোগা না মোটা, ফরসা অথবা কালো, পশমযুক্ত অথবা পশমশূন্য, স্বাধীনভাবে গমনাগমনের ক্ষমতাসম্পন্ন অথবা অবরুদ্ধ অথবা শর্তসাপেক্ষে সীমিতভাবে চলাচলের ক্ষমতাসম্পন্ন,এককথায় নারী-শরীরকে ঘিরে পুরুষতন্ত্রের তাবৎ সিদ্ধান্তগ্রহণের এখতিয়ারকে দেহ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা, বিলিয়ন ডলার সৌন্দর্য-ইন্ডাস্ট্রি, ফতোয়া, সহমরণ, লোকগাথা বা ধর্মীয় পুরাণে সতী নারীদের তিতিক্ষার কাহিনী, দেহব্যবসা, গর্ভপাতের অধিকার প্রশ্নে ভ্যাটিকান ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সহাবস্থান ইত্যাদি দেহ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। কবিতা-সঙ্গীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্যে নারীকে যৌন বস্তুর ভূমিকায় চিত্রিত করাও দেহ রাজনীতির বাইরে নয়।

নারীর শরীর নিয়ে নানামাত্রিক রাজনীতির পুরুষতান্ত্রিক লক্ষ্য হলো নারীর ইতিবাচক পরিচিতি (মেধা, দক্ষতা, ক্ষমতা ইত্যাদি) লুপ্ত করে তাকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা।

Capitalism : পুঁজিবাদ

'পুঁজিবাদ' এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ আর শ্রমিক শোষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সমাজে নারীকে বিবেচনা করা হয় পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে এবং নারীকে শোষণ করা হয় নানাভাবে। অধিকাংশ নারীবাদীগণ একমত যে, নারীর নির্যাতন-নিপীড়নের মর্মান্তিক চিত্র যে দেখে নি; সে পুঁজিবাদী সমাজকে বুঝতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে নারী একটি বিশেষ পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Class : শ্রেণী

একটি সমাজে একই অর্থনৈতিক সম্পত্তির ভিত্তিতে একই ধরনের জীবনযাপনের আওতায় যারা অন্তর্ভুক্ত তাদের সমষ্টিকে একটি শ্রেণী বলে। শ্রেণী-পার্থক্যের প্রধান ভিত্তি সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত নৈকট্য।

সম্পদশালী কর্মকর্তা, শিল্পপতি, শীর্ষ নির্বাহীগণ- যারা উৎপাদিত সম্পদের মালিক অথবা সরাসরি নিয়ন্ত্রক তারা উচ্চবিত্ত শ্রেণী; পেশাজীবীগণ- মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত এবং যারা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে তারা শ্রমজীবী শ্রেণী। সমাজের সম্পদশালী শ্রেণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পদহীন শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করে।

শ্রেণীর আলোকে জেন্ডার ইস্যুকে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হলো নারীর ওপর দ্বৈতশোষণের বোঝা। প্রচলিত সমাজ-কাঠামোয় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে যারা বঞ্চিত বা যারা সম্পদহীন তাদের শোষণ করে সম্পদশালী বা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী শ্রেণীর নারী ও পুরুষ। এছাড়াও শ্রেণীনির্বিশেষে সকল নারীই শোষিত হয় পুরুষতন্ত্র দ্বারা। অর্থাৎ নারী একবার শোষিত হয় শ্রেণীর ক্ষমতা দ্বারা; অন্যবার শোষিত হয় পুরুষতন্ত্র দ্বারা।

১৯৭০ সালে শুলামিথ ফায়ারস্টোন রচনা করেন *দ্য ডায়ালেকটিক অব সেক্স: দ্য কি ফর ফেমিনিস্ট রেভুল্যুশন* শীর্ষক গ্রন্থ। শুলামিথ শ্রেণীবৈষম্যের উৎস হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্যকে উল্লেখ করেন। পুরুষের আধিপত্যের মধ্য দিয়েই লিঙ্গপীড়নের উদ্ভব। সেখান থেকেই যাবতীয় শোষণ-পীড়নের উদ্ভব বলে তাঁর ধারণা।

লিওনোর ডেভিডফ ও ক্যাথরিন হল্ নারীবাদী ইতিহাসবিদ। তাঁদের দু'জনের যৌথ কাজের ফসল *Family Fortunes, Men and Women of the English Middle Class*, ১৭৮০-১৮৫০। ষাট ও সত্তরের দশকে পাশ্চাত্যে লিঙ্গ এবং শ্রেণী বিষয়ে যে নারীবাদী তাত্ত্বিক ধরনের কাজ হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই বইটির সূচনা। ডেভিডফ ও হল দেখিয়েছেন লিঙ্গ এবং শ্রেণী সবসময়ই একত্রে ক্রিয়াশীল এবং শ্রেণীচৈতন্যের সবসময়ই একটা লিঙ্গীয় রূপ আছে। অবশ্যই শ্রেণী পরিচয় এবং লিঙ্গীয় পরিচয় একীভূত হয় না। বস্তুতিকার অর্থে শ্রেণী প্রত্যাশা এবং নারীসত্তার ভেতর একটা বিরোধ কাজ করেছে। উনিশ শতকের মাঝভাগে নারীবাদ বিকাশে সেই বিরোধ শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। ১৯৬৯ সালের *Redstockings Manifesto*-তে নারী একটি শোষিত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে 'শ্রেণী সম্পর্ক' অর্থাৎ 'লিঙ্গীয় রাজনীতি' হচ্ছে শ্রেণী আধিপত্যের রাজনীতি। গার্ডা লার্নারের মতে 'শ্রেণী, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, বর্ণ-

এগুলো নারীর অবস্থান ব্যাখার প্রায় কাছাকাছি পৌছে, কিন্তু পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। নারী নিজেই একধরনের শ্রেণী বা বিন্যাস; তাই সমাজে নারীর অবস্থানের যথার্থ ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন নতুন তাত্ত্বিক প্রত্যয়।

Conditioning : অভ্যস্ত হওয়া

আমাদের সমাজে এমন অনেক ব্যাপার রয়েছে যা সচেতন বা অচেতনভাবে মানুষ মেনে নিতে অভ্যস্ত। এসব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করাও অস্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন স্বামীর সন্তুষ্টিবিধান স্ত্রীর কর্তব্য অথবা অন্নদাতা বা মালিক সর্বদা নমস্য- কিন্তু স্ত্রীর সন্তুষ্টিবিধান স্বামীর জন্য কোন অবশ্যকর্তব্য নয় অথবা মালিক কর্তৃক শ্রমিককে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন মোটেই জরুরি নয়। সমাজসৃষ্ট এই সকল রীতিকে 'স্ত্রী' কিংবা 'শ্রমিক' অন্যায় মনে না করে অবশ্যপালনীয় বলে বিশ্বাস করে। কেননা আমাদের সংস্কৃতিতে এই সকল রীতিনীতিগুলো আদর্শিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ একটি ইতিবাচক ভাব তৈবির মাধ্যমে এই ধরনের রীতিনীতি গ্রহণে চাপ সৃষ্টি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষের, বিশেষত নারীর, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে অনেক কাজে সরাসরি বাধ্য করা হয় যেমন, মৌখিক তালাক বা হিল্লা বিয়ে। এই সমাজের মানুষেরা দীর্ঘদিনের চর্চার মাধ্যমে এইসব বিষয়ের সঙ্গে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সচেতন বা অচেতনভাবে খাপ খাইয়ে নিজেদের অভ্যস্ত করেছে। সে কারণে এর বাইরে বের হওয়া তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চাপে যে প্রক্রিয়ায় জনগণ সমাজের চাহিদা পূরণের যন্ত্র হয়ে ওঠে এবং যে প্রক্রিয়ার ফলে অবশেষে সকল অবস্থাকেই তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তাকে অভ্যস্ত হওয়া বলে। মানুষ শুধু জীব নয়, একইসঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রাণীও বটে। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণীকে যেমন প্রতিকূলতার সঙ্গে অভিযোজন করে খাপ খাইয়ে নিতে হয় অথবা বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রাণী হিসেবে মানুষকেও তেমনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। ফরাসী দার্শনিক জাঁ জাঁক রুশো'র বিখ্যাত উক্তি "মানুষ জন্মমাত্র স্বাধীন, তবু সর্বত্র শৃঙ্খলিত"- এই শর্তায়নে Conditioning-এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নারী।

Empowerment : ক্ষমতায়ন

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সামর্থ্যকে ক্ষমতায়ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয়

পরিভাষা হয়ে ওঠে এবং তা বিশেষভাবে উন্নয়নের সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়। ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন করে। এই সামর্থ্য অর্জনের জন্য দরকার জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এ ধরনের নির্দেশনা দেয় যে, নারীকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে।

ক্ষমতায়নের ধারণার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ বিদ্যমান :

- বস্তুগত সম্পদ- যেমন জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি;
- মানবিক সম্পদ- যেমন মানবদেহ ;
- আর্থিক সম্পদ- যেমন অর্থ;
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ- যেমন জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি
- আদর্শিক সম্পদ- যেমন একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়।

ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফল। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবারই যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও বোঝায় যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেণী, ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে :

- ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন;
- পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা;
- যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন;
- বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদের সুযোগ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারীকে সমর্থ করে তোলা।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর বিষয় বা ইস্যু নয়, একটি সামাজিক বিষয় এবং উন্নয়নের ইস্যু। কেননা নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও

মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও ক্ষমতা অর্পণ করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে।

Female : নারী

আভিধানিকভাবে 'নারী' বলতে বোঝায় এমন এক জৈবিক গঠনের অধিকারী প্রজাতি যার ডিম্বাশয় আছে এবং যে বা যারা ডিম্বাণু তৈরি করতে পারে। তবে সমাজ কর্তৃক নারীর যে ভাবমূর্তি নির্মিত হয়- তা-ই তাকে নারীসুলভ করে তোলে। নারীবাদ এবং জেন্ডার তত্ত্বে এই নির্মাণের বিপক্ষে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

Feminine : নারীসুলভ

বিশেষ কাল ও সংস্কৃতি অনুযায়ী নারীর জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য মানানসই হিসেবে বিবেচিত হয়। পুরুষের তুলনায় নারীকে নমনীয়, ধৈর্যশীল, রমণীয়, স্নেহময়, আবেগপ্রবণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে মানানসই ভাবা হয়। যে নারীর ক্ষেত্রে এসবের ব্যত্যয় হয় সে নারীসুলভ নয় বলে ধিক্কৃত হয়।

শৈশবকাল থেকে মেয়ের ও ছেলের বিচরণক্ষেত্র, খেলাধুলা, শিক্ষাচর্চা, মেলামেশা সবকিছুই ভিন্নভিন্নভাবে অগ্রসর হয়। 'মেয়েলী কথা' 'মেয়েলি হাঁটা' 'মেয়েলি খেলা' 'মেয়েলি গল্প' 'মেয়েলি কাজ' 'মেয়েলি আচরণ' ইত্যাদি অভিধাগুলো সে কারণেই ভিত্তিহীননয়- এগুলো হচ্ছে এমন কথা, খেলা, গল্প, কাজ বা আচরণ যেগুলো এ সমাজে মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা হয়। নারীর জন্য নির্দিষ্ট এসব গুণাগুণ বা গুণাবলী ছেলেদের জন্য সম্মানজনক নয়, অন্যদিকে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট গল্প, কাজ, আচরণ, হাঁটা, কথাও মেয়েদের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়। কেননা তাতে মেয়েদের প্রধান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত কমনীয়তা, সৌন্দর্য, লাবণ্য, লাজনম্রতা ক্ষুণ্ন হয়।

পুরুষ মহৎ কাজ করবে, নারী তাকে প্রেরণা দেবে; পুরুষ আহত হবে, নারী তার সেবা করবে; পুরুষ ক্ষুধার্ত হবে, নারী খাবার যোগান দেবে; পুরুষ কমনীয় ভালবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত হবে, নারী তাকে শীতল করবে; পুরুষ যৌন তাড়নায় অস্থির হবে, নারী তাকে সুস্থির করবে- এসব ধারণা খুব স্বাভাবিক বলেই গণ্য করা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত এসব ধ্যানধারণা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঘরে-বাইরে দৈনন্দিন কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা, গালি, গান, নাটক, চলচ্চিত্র, পত্রিকা, ঝগড়া সবকিছুর

মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষের এই ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার ওপর ভিত্তি করে রচিত অবস্থান পোক্ত হয়।

আমাদের সমাজে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে নারী সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধের প্রধান ধারা বিশ্লেষণ করলে নারীর যে নারীসুলভ ভাবমূর্তি বা আদর্শ নারীর প্রতিমূর্তি পাওয়া যায় তা এরকম :

- মেয়েরা ঘরের শোভা;
- যতই শিক্ষিত হোক বা চাকরি করুক, মেয়েদের আসল কাজ ঘরে;
- বাচ্চা, স্বামী ও স্বামীর পরিবারের কাজ ঠিক রেখে চাকরি করতে পারলে করুক;
- ভাল মেয়ে হলো নরম, নমনীয়, কমনীয়, দুর্বল, চাপাস্বভাব, স্বামী বা পরিবারের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত; সাত চড়ে রা কাড়ে না;
- মেয়েরা ছেলেদের চাইতে শারীরিকভাবে দুর্বল এবং মেধা, মনন, কর্মক্ষমতার দিক থেকে নিকৃষ্ট;
- স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত, ইত্যাদি।

Feminism : নারীবাদ

নারীবাদের ধারণা নারীর ওপর নিপীড়ন ও তা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত মতের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। নারীবাদ একটি সামাজিক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য :

- নারীর চিরাচরিত ভূমিকা ও ভাবমূর্তির পরিবর্তন ঘটানো;
- যৌনতার ঘেরাটোপ থেকে নারীকে মুক্ত করা; এবং
- নারীর জন্য পুরুষের সমঅধিকার অর্জন করা।

নারীবাদের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। সকল ধারার সকল নারী একইভাবে নারীবাদের সব বিষয়ে সহমত নয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন নারীর ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নারীবাদের বিভিন্ন ধারা তৈরি হয়েছে। প্রধান ধারাগুলোর পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে নিচে দেয়া হলো :

Cultural Feminism : সাংস্কৃতিক নারীবাদ

সাংস্কৃতিক নারীবাদের ধারণাটি তৈরি হয়েছে অংশত আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদ থেকে এবং অংশত সমাজতন্ত্রী নারীবাদ থেকে। সাংস্কৃতিক নারীবাদ মনে

করে সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান তৈরি হয়েছে লৈঙ্গিকপার্থক্যের ভিত্তিতে এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে; সুতরাং এটি পরিবর্তনযোগ্য। নারী এবং পুরুষ যে প্রক্রিয়ায় লিঙ্গভিত্তিতে নির্ধারিত ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন ও আচরণ করতে শেখে, সেই প্রক্রিয়াটি জরুরিভিত্তিতে পরিবর্তনের ওপর সাংস্কৃতিক নারীবাদ জোর দেয়।

Ecofeminism : প্রতিবেশ নারীবাদ

প্রতিবেশ নারীবাদের ধারণাটি যে সত্যের বা মতের ভিত্তিতে সৃষ্ট, তা হলো নারী ও প্রকৃতি উভয়েই পুরুষশাসিত কাঠামোর শত প্রতিকূলতার মাঝে বহু শতাব্দ ধরে শোষিত হয়েও টিকে আছে। ভারতের প্রতিবেশ নারীবাদী শতাব্দী শিবা'র মতে, শক্তিশালী শারীরিক কাঠামোর কারণে নারী এবং প্রকৃতির ওপর পুরুষ প্রভুত্ব বিস্তারকারী বা কর্তৃত্বশীল। এ কারণেই তিনি লিখেছেন, 'জীবন সৃষ্টিকারী ও জীবন ধারক' এই সত্তা থেকে নারী এবং প্রকৃতিকে নামিয়ে এনে স্রেফ 'সম্পদে' পরিণত করা হয়েছে।

Ecofeminism গ্রন্থের যৌথ রচয়িতা মারিয়া মাইজ ও বন্দনা শিবা দেখিয়েছেন ভারতের নর্মদা নদীর উপর বাঁধ একদিকে যেমন নদী বা প্রকৃতিকে রাষ্ট্র বা পুরুষ কর্তৃক অবদমিত করে, তেমনি এই বাঁধ নর্মদা নদীতীরে বসবাসরত আদিবাসী ও বিশেষত আদিবাসী নারীদের নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া আরো জোরদার করবে। পরিবেশ নারীবাদ রেনেসাঁসের দ্বিকোটি-করণ প্রক্রিয়াকে (Dichotomy) চূড়ান্তভাবে সমালোচনা করে যা সব সময়ই পুরুষ/নারী, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, মস্তিষ্ক/জননাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ/অশ্বেতাঙ্গ- এভাবে সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করে এবং প্রথমোক্তকে শেষোক্তের থেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে অনুমান করে নেয়। পরিবেশ নারীবাদীরা আরো বলেন যে, ফ্রান্সিস বেকনের সময় থেকে "বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে অবাধ্য ও দুষ্ট রমণীর ন্যায় বশ ও জয় করার" সংকল্প ঘোষিত ও বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে।

Global Feminism : বৈশ্বিক নারীবাদ

প্রতিবেশ প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান দেখতে পারা যায়, এমন একটি কর্মকাঠামো তৈরির জন্য উন্নয়ন গবেষণায় নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সকল দেশের অর্থনীতিতেই নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতি কিছু ঔদাসীন্য রয়েছে। এই ঔদাসীন্যের কারণে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী সকল দেশেরই দরিদ্রতম শ্রেণীর নারী। নারীর অর্থনৈতিক ও প্রজনন-শ্রম নিজ

নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একেক পুরুষশাসিত সমাজে একেকরকম প্রক্রিয়া রয়েছে। যৌনসর্বস্বতামুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার কৌশল বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারে যাতে নারীরা নিজ নিজ সমাজে নিজেদের সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিত ও দূরীভূত করতে সমর্থ হয়।

Liberal Feminism : উদার নারীবাদ

বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর ভেতর থেকেই নারী-পুরুষের সমতার জন্য সংগ্রাম করে উদার নারীবাদীগণ। এই সংগ্রামে নারীর কিছু অধিকার অর্জিত হয়েছে। যেমন- ভোটাধিকার।

Radical Feminism : আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদ

এটি একটি চরমপন্থী আন্দোলন যার কোন তত্ত্বীয় পরম্পরা নেই। কিন্তু আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদীরা নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের ধরন বা কাঠামোকে পুরুষ-প্রভুত্বের একটি সম্প্রসারিত নীতি হিসেবে দেখে। নিজের জীবন নিজে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে এমন এক সমাজসত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব যার মৌল নীতি 'যা কিছু ব্যক্তিগত তা সবই রাজনৈতিক'। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদ মনে করে নারীকেন্দ্রিক (বা নারীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে) নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিশ্লেষণকে একটি কৌশল হিসেবে উন্নীত করার জন্য নারী আন্দোলনের স্বয়ম্ভর হওয়া প্রয়োজন। কেননা নারী আন্দোলন স্বয়ম্ভর হলেই নারীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষিত হবে। আমূল সংস্কারবাদী আন্দোলন যে ইস্যুকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে তা হলো যৌন রাজনীতি ও নারীর প্রতি সহিংসতা।

Marxist Feminism : মার্কসীয় নারীবাদ

মার্কসবাদ সর্বপ্রথম নারীর বিষয়টি সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির মধ্যে স্থাপন করে ও তাকে যে কোন বিপ্লবী রূপান্তরের অপরিহার্য সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৭৩ সালে একাধিক মার্কসীয় নারীবাদী গোষ্ঠী গঠিত হয়। মেরী বেইলী এমনই একটি গোষ্ঠীর মুখপাত্র। তিনি বলেন, "মার্কসীয় নারীবাদী হিসেবে আমরা এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আছি। এই যোগ চিহ্নকে আমরা এখনও পরিষ্কার করতে পারি নি; মার্কসবাদ ও নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্দেশিত বিপ্লবই

আমরা চাই। এই অবস্থানের কারণে এখন নারীবাদী ভগ্নীদের কাছে আমরা মার্কসবাদী এবং মার্কসবাদী ভ্রাতাদের কাছে আমরা নারীবাদী"।

মার্কস-এঙ্গেলস মানবশৃঙ্খলের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে নারীর শৃঙ্খল এবং মানবমুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নারীর মুক্তিকে নির্দেশ করেছিলেন। বিবাহ ও পরিবারকে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা ও তাকে মহিমান্বিত করার দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁরা খারিজ করেছেন আগেই। দেখিয়েছেন কীভাবে বিবাহ ও পরিবার এবং সেই সূত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও নারীর অধস্তনতার ধরন ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ক্রমে সমাজবিকাশের মধ্য দিয়ে মুক্ত ব্যক্তি হিসেবে নারীর উত্থানের শর্ত পরিপক্ক হচ্ছে। পরিবারের মধ্যে নারীর অবস্থান, নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, নারীকে অধস্তন রাখার জন্য ধর্মের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও তাঁরা লিখেছেন। তাঁদের সময়ে তো বটেই এমন কি, পরে শতাধিক বছরে নারী প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখাই নারীকে মুক্ত করবার অনেক কার্যকর দিকনির্দেশনা দান করেছে।

মার্কসবাদী নারীবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী যাঁরা প্রধানত নারীমুক্তির কর্মসূচিকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করেন এবং সাধারণভাবে মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন, তাঁরাও মার্কস-এঙ্গেলসকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখেন নি। তবে এই সমালোচনা নারীমুক্তি আন্দোলনে মার্কসবাদের শক্তিশালী প্রাসঙ্গিকতা খারিজ করে না, বরঞ্চ তাকে আরও প্রাসঙ্গিকভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে।

এসব সমালোচনার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে, নারীর পারিবারিক বা গার্হস্থ্য শ্রমকে পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের হিসেবের মধ্যে না আনা। শ্রমিক বলতে প্রধানত পুরুষকে বোঝানো হয়। শোষণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়নের উপর একক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, লিঙ্গীয় নিপীড়নের দিকটি সে কারণে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। একই কারণে পরিবারের ভেতর ও বাইরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের মধ্যে যে পুরুষতান্ত্রিক উপাদানগুলো সক্রিয় থাকে, সেগুলোও যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। গুরুত্ব পায় নি সন্তানধারণ-পালনের মধ্যে নারীর শ্রমের ও নারী শোষণের দিকটি, গুরুত্ব পায় নি গার্হস্থ্য শ্রমে নারীর একক ও বৈষম্যমূলক অংশগ্রহণের দিকটি। বলা হয় নারীর শরীর এবং নারী হওয়ার কারণে তার ওপর শোষণ ও পীড়নের দিকটি

যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে শোষণতন্ত্রের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তা সমাজের সামগ্রিকতা ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Socialistic Feminism : সমাজতন্ত্রী নারীবাদ

মার্কসীয় নারীবাদ ও আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদের সংমিশ্রণে সমাজতন্ত্রী নারীবাদের উদ্ভব। সমাজতন্ত্রী নারীবাদের নজর হলো সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কাঠামোসমূহের প্রতি– যেখানে নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থানে ফেলে রাখা হয়েছে বা হয়ে থাকে এবং যেখানে নারীর অর্থনৈতিক শ্রমের কোন মূল্য নেই। তাই সমাজতন্ত্রী নারীবাদ নারী এবং তার কর্মকেন্দ্রিক 'নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান' ইস্যুটিকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে।

রোজা লুক্সেমবার্গ, ক্লারা জেৎকিন, আলেক্সান্দ্রা কল্লোন্তাই বা লেনিনের রচনা সমাজতন্ত্রী নারীবাদী ধ্যান-ধারণার আকর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Feminist : নারীবাদী

বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনের মূল নীতি ও লক্ষ্য হলো নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই নীতি-লক্ষ্যের অনুসারীগণ নারীবাদী। পুরুষেরা নারীবাদী হতে পারে কিনা এ নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে, কিন্তু এখনও এই বৈপ্লবিক আন্দোলনটির ভিত্তি পুরুষশাসনের আওতায় নারীদের অভিজ্ঞতা। তবে সহমর্মী পুরুষদের নারীবাদপন্থী বা নারীবাদ-সমর্থক বলা হয়ে থাকে।

ষাট ও সত্তর-এর দশকে নারীর অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মিত হয় তারই সম্প্রসারণ চলছে এখন পর্যন্ত। এ সময়ে নারীর অধিকারের প্রশ্নে তাত্ত্বিকদের মধ্যে আমরা যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হই তাঁরা হলেন : বেটি ফ্রাইডান, এঞ্জেলা ডেভিস, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, জার্মেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট, জুলিয়েট মিশেল, শিলা রোবোথাম, এ্যানে শোয়েট, জিল্লা আইজেনস্টাইন প্রমুখ। দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও এঁদের উত্থান বস্তুত নারী-আন্দোলনের বাস্তব তাগিদেরই ফল। সত্তর ও আশির দশকে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলেও নারীবাদী লেখকদের সবল আবির্ভাব দেখা যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিসরের নাওয়াল আল সাদাত্তয়ি, মরক্কোর ফাতিমা মারেনিসি প্রমুখ।

৬০-এর দশকে বেটি ফ্রাইডান তাঁর *The Feminine Mystic* গ্রন্থে মূল বক্তব্য হিসেবে বলেন যে, স্বামী ও সংসার- এই প্রধান লক্ষ্য নিয়ে যে নারী সদাব্যস্ত, অথবা একের পর এক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে নিজের বাজারদর ঠিক রাখছে যে নারী, সেই নারীর প্রধান সমস্যা তার পরিচয়-সংকট।

নারীর যৌন স্বাধীনতা বিশেষত পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তিলাভের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে এ্যানে শোয়েট লেখেন *দা মিথ অব দা ভ্যাজাইনাল অরগাজম*। কেট মিলেট-এর *Sexual Politics* প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর New York Times মিলেটকে নারীবাদের প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে বর্ণনা করেন।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বলে পরিচিত জুলিয়েট মিশেল নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য নতুন তত্ত্ব নির্মাণের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, যে কোন সমাজে নারীর অবস্থা ৪টি উপাদান বা কাঠামো ঘিরে আবর্তিত হয়। এগুলো হলো : উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, যৌনতা ও শিশুদের সামাজিকীকরণ।

যাঁরা নারীর অধস্তনতাকে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের ফল হিসেবে দেখেছেন, তাঁরা Radical Feminist নামে পরিচিত। শুলাম্মিথ এদের মধ্যে সবচাইতে বিস্তৃতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

মারিয়া মাইজ বৈশ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গতিশীলতায় নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নারী আন্দোলনে Sex ও Genderকে ভিন্নভাবে দেখা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ আয়োজিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করবার যে কর্মসূচি নেয়া হয় তাকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন মারিয়া। মারিয়া বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারীর সস্তা শ্রম পুঁজির জন্য সহজলভ্য করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। তিনি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারী এখন চারটি ক্ষেত্রে কাজ করছে (১) রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, (২) বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য শিল্প, (৩) কৃষি এবং (৪) যৌনশিল্প। তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্যাংককের শতকরা ১০ ভাগ নারী যৌনশিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বের ভিডিও চলচ্চিত্রের শতকরা ৪৩ ভাগ বীভৎসতা ও যুদ্ধ নিয়ে রচিত। শতকরা ২০ ভাগ পর্ণো।

যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে শোষণতন্ত্রের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তা সমাজের সমর্থনও ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Socialistic Feminism : সমাজতন্ত্রী নারীবাদ

মার্কসীয় নারীবাদ ও আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদের সংমিশ্রণে সমাজতন্ত্রী নারীবাদের উদ্ভব। সমাজতন্ত্রী নারীবাদের নজর হলো সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কাঠামোসমূহের প্রতি– যেখানে নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থানে রেখে রাখা হয়েছে বা হয়ে থাকে এবং যেখানে নারীর অর্থনৈতিক শ্রমের কোন মূল্য নেই। তাই সমাজতন্ত্রী নারীবাদ নারী এবং তার কর্মকেন্দ্রিক 'নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান' ইস্যুটিকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে।

রোজা লুক্সেমবার্গ, ক্লারা জেৎকিন, আলেক্সান্দ্রা কল্লোন্তাই বা লেনিনের রচনা সমাজতন্ত্রী নারীবাদী ধ্যান-ধারণার আকর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Feminist : নারীবাদী

বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনের মূল নীতি ও লক্ষ্য হলো নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই নীতি-লক্ষ্যের অনুসারীগণ নারীবাদী। পুরুষেরা নারীবাদী হতে পারে কিনা এ নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে, কিন্তু এখনও এই বৈপ্লবিক আন্দোলনটির ভিত্তি পুরুষশাসনের আওতায় নারীদের অভিজ্ঞতা। তবে সহমর্মী পুরুষদের নারীবাদপন্থী বা নারীবাদ-সমর্থক বলা হয়ে থাকে।

ষাট ও সত্তর-এর দশকে নারীর অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মিত হয় তারই সম্প্রসারণ চলছে এখন পর্যন্ত। এ সময়ে নারীর অধিকারের প্রশ্নে তাত্ত্বিকদের মধ্যে আমরা যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হই তাঁরা হলেন বেটি ফ্রাইডান, এঞ্জেলা ডেভিস, গুলাম্বিথ ফায়ারস্টোন, জার্মেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট, জুলিয়েট মিশেল, শিলা রোবোথাম, এ্যানে শোয়েট, ভিক্টর মাইকেলস্টাইন প্রমুখ। দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও এঁদের উত্থান বস্তুত নারী-আন্দোলনের বস্তুবাদী তাত্ত্বিকদেরই ফল। সত্তর ও আশির দশকে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলেও নারীবাদী লেখকদের সবল আবির্ভাব দেখা যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিসরের নাওয়াল আল সাদাওয়ি, মরক্কোর ফাতিমা মার্নিসি প্রমুখ।

৬০-এর দশকে বেটি ফ্রাইডান তাঁর *The Feminine Mystic* গ্রন্থে মূল বক্তব্য হিসেবে বলেন যে, স্বামী ও সংসার- এই প্রধান লক্ষ্য নিয়ে যে নারী সন্তুষ্ট, অথবা একের পর এক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে নিজের বাজারদর ঠিক রাখছে যে নারী, সেই নারীর প্রধান সমস্যা তার পরিচয়-সংকট।

নারীর যৌন স্বাধীনতা বিশেষত পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তিলাভের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে এ্যানে শোয়েট লেখেন *দা মিথ অব দা ভ্যাজাইনাল অরগাজম*। কেট মিলেট-এর *Sexual Politics* প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর New York Times মিলেটকে নারীবাদের প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে বর্ণনা করেন।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বলে পরিচিত জুলিয়েট মিশেল নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য নতুন তত্ত্ব নির্মাণের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, যে কোন সমাজে নারীর অবস্থা ৪টি উপাদান বা কাঠামো ঘিরে আবর্তিত হয়। এগুলো হলো : উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, যৌনতা ও শিশুদের সামাজিকীকরণ।

যাঁরা নারীর অধস্তনতাকে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের ফল হিসেবে দেখেছেন, তাঁরা Radical Feminist নামে পরিচিত। শুলামিথ এদের মধ্যে সবচাইতে বিস্তৃতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

মারিয়া মাইজ বৈশ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গতিশীলতায় নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নারী আন্দোলনে Sex ও Genderকে ভিন্নভাবে দেখা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ আয়োজিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করবার যে কর্মসূচি নেয়া হয় তাকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন মারিয়া। মারিয়া বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারীর সস্তা শ্রম পুঁজির জন্য সহজলভ্য করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। তিনি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারী এখন চারটি ক্ষেত্রে কাজ করছে (১) রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, (২) বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য শিল্প, (৩) কৃষি এবং (৪) যৌনশিল্প। তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্যাংককের শতকরা ১০ ভাগ নারী যৌনশিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বের ভিডিও চলচ্চিত্রের শতকরা ৪৩ ভাগ বীভৎসতা ও যুদ্ধ নিয়ে রচিত। শতকরা ২০ ভাগ পর্ণো।

যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে শোষণতন্ত্রের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তা সমাজের সামগ্রিকতা ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Socialistic Feminism : সমাজতন্ত্রী নারীবাদ

মার্কসীয় নারীবাদ ও আমূল সংস্কারবাদী নারীবাদের সংমিশ্রণে সমাজতন্ত্রী নারীবাদের উদ্ভব। সমাজতন্ত্রী নারীবাদের নজর হলো সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কাঠামোসমূহের প্রতি– যেখানে নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থানে ফেলে রাখা হয়েছে বা হয়ে থাকে এবং যেখানে নারীর অর্থনৈতিক শ্রমের কোন মূল্য নেই। তাই সমাজতন্ত্রী নারীবাদ নারী এবং তার কর্মকেন্দ্রিক 'নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান' ইস্যুটিকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে।

রোজা লুক্সেমবার্গ, ক্লারা জেৎকিন, আলেক্সান্দ্রা কল্লোন্তাই বা লেনিনের রচনা সমাজতন্ত্রী নারীবাদী ধ্যান-ধারণার আকর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Feminist : নারীবাদী

বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনের মূল নীতি ও লক্ষ্য হলো নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই নীতি-লক্ষ্যের অনুসারীগণ নারীবাদী। পুরুষেরা নারীবাদী হতে পারে কিনা এ নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে, কিন্তু এখনও এই বৈপ্লবিক আন্দোলনটির ভিত্তি পুরুষশাসনের আওতায় নারীদের অভিজ্ঞতা। তবে সহমর্মী পুরুষদের নারীবাদপন্থী বা নারীবাদ-সমর্থক বলা হয়ে থাকে।

ষাট ও সত্তর-এর দশকে নারীর অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মিত হয় তারই সম্প্রসারণ চলছে এখন পর্যন্ত। এ সময়ে নারীর অধিকারের প্রশ্নে তাত্ত্বিকদের মধ্যে আমরা যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হই তাঁরা হলেন : বেটি ফ্রাইডান, এঞ্জেলা ডেভিস, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, জার্মেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট, জুলিয়েট মিশেল, শিলা রোবোথাম, এ্যানে শোয়েট, জিল আইজেনস্টাইন প্রমুখ। দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও এঁদের উত্থান বস্তুত নারী-আন্দোলনের বাস্তব তাগিদেরই ফল। সত্তর ও আশির দশকে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলেও নারীবাদী লেখকদের সবল আবির্ভাব দেখা যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিসরের নাওয়াল আল সাদাওয়ি, মরক্কোর ফাতিমা মারেনিসি প্রমুখ।

৬০-এর দশকে বেটি ফ্রাইডান তাঁর *The Feminine Mystic* গ্রন্থে মূল বক্তব্য হিসেবে বলেন যে, স্বামী ও সংসার- এই প্রধান লক্ষ্য নিয়ে যে নারী সদাব্যস্ত, অথবা একের পর এক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে নিজের বাজারদর ঠিক রাখছে যে নারী, সেই নারীর প্রধান সমস্যা তার পরিচয়-সংকট।

নারীর যৌন স্বাধীনতা বিশেষত পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তিলাভের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে এ্যানে শোয়েট লেখেন *দা মিথ অব দা ভ্যাজাইনাল অরগাজম*। কেট মিলেট-এর *Sexual Politics* প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর New York Times মিলেটকে নারীবাদের প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে বর্ণনা করেন।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বলে পরিচিত জুলিয়েট মিশেল নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য নতুন তত্ত্ব নির্মাণের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, যে কোন সমাজে নারীর অবস্থা ৪টি উপাদান বা কাঠামো ঘিরে আবর্তিত হয়। এগুলো হলো : উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, যৌনতা ও শিশুদের সামাজিকীকরণ।

যাঁরা নারীর অধস্তনতাকে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের ফল হিসেবে দেখেছেন, তাঁরা Radical Feminist নামে পরিচিত। শুলামিথ এদের মধ্যে সবচাইতে বিস্তৃতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

মারিয়া মাইজ বৈশ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গতিশীলতায় নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নারী আন্দোলনে Sex ও Genderকে ভিন্নভাবে দেখা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ আয়োজিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করবার যে কর্মসূচি নেয়া হয় তাকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন মারিয়া। মারিয়া বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারীর সস্তা শ্রম পুঁজির জন্য সহজলভ্য করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। তিনি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারী এখন চারটি ক্ষেত্রে কাজ করছে (১) রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, (২) বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য শিল্প, (৩) কৃষি এবং (৪) যৌনশিল্প। তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্যাংককের শতকরা ১০ ভাগ নারী যৌনশিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বের ভিডিও চলচ্চিত্রের শতকরা ৪৩ ভাগ বীভৎসতা ও যুদ্ধ নিয়ে রচিত। শতকরা ২০ ভাগ পর্ণো।

১৯৪৯ সালে সিমন দ্য বোভোয়া *Second Sex* লিখে নারীবাদী চেতনার অগ্রণীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবে তারও বহু আগে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি নারী বেগম রোকেয়ার মন-মানসেও নারীবাদী চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। এমন এক সমাজে বসে রোকেয়া নারীবাদী ঘোষণাপত্র *(স্ত্রীজাতির অবনতি)* অথবা নারীবাদী ইউটোপিয়া *(সুলতানার স্বপ্ন)* রচনা করেছেন যে সমাজ ছিল নারীশিক্ষার আলোক থেকে আলোকবর্ষ দূরে এবং নারীরা অবরোধ প্রথায় গৃহাভ্যন্তরে অন্তরীণ ও মানসিক দাসত্বে বিপর্যস্ত।

উনবিংশ শতকের উদারনৈতিক নারীবাদীদের প্রধান দাবি ছিল-ব্যক্তির অধিকার, সমানাধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভোটের অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, নির্বাচন, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সমান সুযোগ-সুবিধা। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা পিতৃতন্ত্রকে প্রধান শত্রু বলে মনে করে। তারপর সত্তরে আত্মপ্রকাশ ঘটে মার্কসবাদী ফেমিনিস্টদের। এই নারীবাদীদের চেতনা সক্রিয় হয়েছে- নারীর শ্রমশোষণ, যৌনতার অপব্যবহার, পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকে শোষণ, পুরুষ আধিপত্য, পিতৃতন্ত্র, অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, কর্মবিভাজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

আজকের নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা শুরু ফরাসি বিপ্লবের আগে। ইউরোপে চার্চ ও রাষ্ট্রের যৌথ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক মেয়েই যে প্রতিবাদ করেছিলেন কিংবা অনেক মেয়েই যে ঐ স্বৈরশাসনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তা অনুমান করা যায় লাখো মেয়েকে 'ডাইনি' নামে অভিহিত করা এবং তাঁদের নির্যাতন ও হত্যা করার ঘটনা থেকে। ইউরোপের দ্রুত পরিবর্তনশীল (ফরাসি বিপ্লবোত্তর) পরিপ্রেক্ষিতে মেরী ওলস্টোন ক্রাফটের বিখ্যাত গ্রন্থ *A Vindication of the Rights of Women* প্রকাশিত হয়। নারী অধিকারের প্রশ্নটি এ গ্রন্থেই প্রথম জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়। এ গ্রন্থে মেরী শুধু লিঙ্গবৈষম্যের কথাই বলেন নি; শ্রেণী প্রশ্নকেও যুক্ত করেছেন নানাভাবে সমগ্র সমাজের বিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, দর্শনের বিকাশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল-সেটাই নারী-প্রজন্মকে ক্রমে জোরালো করতে থাকে। ১৮৬০ সালের আগে ইউরোপে পরিবারের বিবর্তন বিষয়ক লেখালেখি, অনুসন্ধান সুষ্ঠুভাবে হওয়ার অবস্থা ছিল না। এরপর মর্গানের *আদিম সমাজ* এবং ডারউইনের *বিবর্তনবাদের তত্ত্ব* শাশ্বত মানুষ,

শাশ্বত পরিবার, শাশ্বত নারী, নারীর ঈশ্বরপ্রদত্ত ভূমিকা ইত্যাদি ধারণাকে ভেঙে দিতে থাকে।

ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশেও সে সময় নারীর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, সংঘাত বাড়তে থাকে। সতীদাহ প্রথা রদ নিয়ে রামমোহন রায় নারীবিষয়ক সামাজিক ইস্যুকে স্পর্শ করেছিলেন (১৮২৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনের (১৮৫৫) মধ্য দিয়ে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তবে ভারতে ও বঙ্গদেশে নারীবিষয়ক চিন্তার সমাজভিত্তিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কমই। সেজন্য নারীমুক্তির চিন্তা নারীর শিক্ষাগ্রহণের অধিকারের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল।

প্রথম আন্তর্জাতিক নারী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালে স্টুটগার্ডে। স্টুটগার্ডের সম্মেলনে ১৫টি দেশ থেকে প্রতিনিধি অংশ নেয় এবং সেই সম্মেলনে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী ব্যুরো গঠন করা হয়। প্রথম সম্পাদক হন ক্লারা জেৎকিন। এ হিসাবে ক্লারা জেৎকিনই আন্তর্জাতিক নারী-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯১০ সালে। এই সম্মেলনে ক্লারা জেৎকিন ১৮৫৭ ও ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে সমাজতন্ত্রী-নেতৃত্বে নারী শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ-স্মরণ করে ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে পালনের প্রস্তাব দেন। সে অনুযায়ী এই দিবস প্রতিবছর নারীপ্রশ্ন নিয়ে আন্তর্জাতিক চিন্তা ও সক্রিয়তাকে শাণিত করে। পরে জাতিসংঘ থেকেই দিবসটি পালন শুরু হয়, তবে এর বিপ্লবী মাত্রা ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

Gender : জেন্ডার

'সামাজিক লিঙ্গ', 'নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক'– ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দবন্ধ প্রস্তাবিত হলেও জেন্ডার এই শব্দটির এখন পর্যন্ত কোন যথাযথ বাংলা পরিভাষা আবিষ্কৃত হয় নি। এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা ও গবেষণা সত্ত্বেও শব্দটির আভিধানিক বাংলা নির্ধারণ সম্ভব না হওয়ায় আমরা এই জেন্ডারকোষে জেন্ডারসংক্রান্ত শব্দভান্ডার ব্যাখ্যা ও বঙ্গীয়করণ করার প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও ধারণাগত বিস্তারণ ছাড়া শব্দ হিসেবে জেন্ডারের পরিভাষা হিসেবে জেন্ডার-ই ব্যবহার করেছি।

জেন্ডার ও সেক্স-দুটোরই আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ। তবে ধারণাগতভাবে জেন্ডার অর্থ সামাজিক লিঙ্গ এবং সেক্স অর্থ জৈবিক লিঙ্গ। যে বৈশিষ্ট্য নারী ও পুরুষের জৈবিক বা শারিরীক ভূমিকা নির্দিষ্ট করে (অর্থাৎ পুরুষ শুক্রাণু উৎপাদন করে এবং নারী ডিম্বাণু উৎপাদন করে) তাকে সেক্স-কেন্দ্রিক ভূমিকা বলা যেতে পারে। অন্যদিকে 'জেন্ডার' শব্দটি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সমাজে নারী ও পুরুষের তুলনামূলক বা পৃথক ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সুযোগের পরিস্থিতি বা ধারণা বোঝায়। মূলত 'জেন্ডার' শব্দটি দ্বারা সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থানের বৈষম্য বা অসমতা নির্দেশিত বা বিশ্লেষিত হয়।

এ্যান ওকলে-উদ্ভাবিত সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যকার ধারণাগত পার্থক্যের তত্ত্বটিই বর্তমানে এ সংক্রান্ত ধারণা বিশ্লেষণের সবচেয়ে উপযোগী কৌশল। এই পার্থক্য অনুসারে সেক্স জৈবিকবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সমাজে নারী বা পুরুষের জেন্ডার-ভূমিকা স্থির হয় সামাজিক এবং মানসিক (অর্থাৎ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক) উপাদান দ্বারা।

নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ এগুলো মানুষ/সমাজ সৃষ্টি করে নি। অন্যদিকে জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ সামাজিকভাবে সৃষ্ট। অর্থাৎ সমাজ পুরুষকে 'পুরুষ' হিসেবে এবং নারীকে 'নারী' হিসেবে নির্মাণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে শেখায়। নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয় জৈবিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুরুষরা সন্তান ধারণ করতে পারে না। নারী সন্তান ধারণ করে। প্রাকৃতিক এই নিয়ম বা বিধান অনুযায়ী তাদের জৈবিক ভূমিকাও ভিন্ন।

সমাজের সদস্য হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ জৈবিক/প্রাকৃতিক লিঙ্গের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের সামাজিক আচরণ/ভূমিকা নির্দিষ্ট করে। যেমন নারী সন্তান ধারণ করে বলে পুনরুৎপাদনমূলক (গার্হস্থ্য) কাজ ও সন্তান-প্রতিপালন কাজের দায়িত্ব কেবল নারীর। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষের যে জৈবিক ভূমিকা রয়েছে তা সমাজ, সংস্কৃতি, কাল, শ্রেণী ইত্যাদি নির্বিশেষে একইরকম থাকে। কিন্তু জেন্ডার-নির্ধারিত ভূমিকাগুলো সমাজ-সংস্কৃতিভেদে বিভিন্নরকম হতে পারে। একই সমাজে/সংস্কৃতিতে কালানুক্রমেও জেন্ডার-ভূমিকা পরিবর্তিত হতে পারে। এমন কি একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণী বা

সংস্কৃতি-অনুযায়ী জেন্ডার ভূমিকার বিভিন্নতা রয়েছে। সমাজ যত জটিল হচ্ছে নারী-পুরুষের ভূমিকাও আর কেবল সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত না থেকে বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ফলে জেন্ডার-সংক্রান্ত ধারণারও ব্যাপ্তি ঘটছে।

প্রাকৃতিক ভূমিকা যেমন স্থির, জেন্ডার-ভূমিকা তেমন স্থির কোন ধারণা নয়। যেমন, অনগ্রসর সমাজের নারীরা কেবল গৃহকর্ম ও সন্তান প্রতিপালন করে। অগ্রসর সমাজে নারীরা উপার্জন করে, প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে দায়িত্ব পালন করে ইত্যাদি।

Gender Analysis : জেন্ডার বিশ্লেষণ

কোন ঘটনায়, প্রকল্পে, প্রতিষ্ঠানে, গ্রামে, কার্যালয়ে, গোত্রে, কাঠামোতে, উপকরণে বা এমন কি ভাবমূর্তিতে নারী এবং পুরুষের সংখ্যার তুলনা করা বা ভাবমূর্তি উপস্থাপনের ধরন বা নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের পরিমাণগত ও গুণগত ধরন যাচাই করাই জেন্ডার বিশ্লেষণ। তুলনা করবার প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে সহজ। জটিল প্রক্রিয়া হলো গণনাকৃত নারী এবং পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, কোন ধরনের সম্পদের ওপর কার (গণনাকৃত নারী এবং পুরুষ) কতটুকু অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেটি চিহ্নিত করা এবং বয়স, শ্রেণী ও জাতিগত পার্থক্য বিবেচনায় রাখা।

জেন্ডার বিশ্লেষণ সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, সম্পর্ক ও সম্পর্কের অসমতা তুলে ধরে। যেমন আশির দশকের জেন্ডার বিশ্লেষিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঃ

- পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ কাজ নারীরা করে;
- নারীরা পৃথিবীর দশভাগের একভাগ উপার্জন করে;
- পৃথিবীর এক শতাংশের কম সম্পদ নারীর দখলে; ইত্যাদি।

জেন্ডার বিশ্লেষণ ভূমিকা, কর্মকাণ্ড এবং সম্পর্কের ওপর দৃষ্টি দেয়। কে কী করে এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয় বরং কে সিদ্ধান্ত নেয়, কে তার থেকে সুবিধা পায়, কে সম্পদ (যেমন- জমি) ব্যবহার করে এবং কে এই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, কি কি উপাদান সম্পর্ককে প্রভাবিত করে (যেমন- সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন) ইত্যাদিও প্রশ্ন হিসেবে গৃহীত হয়।

উন্নয়নে জেন্ডার বিশ্লেষণের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রাথমিক বাস্তবসম্মত কাজ হলো নারীদের সঙ্গে কথা বলা, আলোচনা করা যেন তাদের ভূমিকা ও চাহিদা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

Gender Analysis Framework : জেন্ডার বিশ্লেষণী কাঠামো

যখন কোন প্রকল্পের আওতায় একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন সেই প্রকল্প চক্রের বিভিন্নস্তরে জেন্ডার চাহিদা নিরুপণ এবং জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রকল্প মূল্যায়নের বিভিন্ন বিশ্লেষণী কৌশল রয়েছে। এই কৌশলকে জেন্ডার বিশ্লেষণী কাঠামো বা Gender Analysis Framework বলা হয়। জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহৃত হয় 'মোজারের জেন্ডার পরিকল্পনা কাঠামো' (Moser's Gender Planning Framework) 'হার্ভার্ড বিশ্লেষণী কাঠামো' (Harvard Analysis Framework), 'সামর্থ্য ও ভঙ্গুরতা বিশ্লেষণ কাঠামো' (Capacity and Vulnerability Analysis Framework), লংওয়ে চাহিদা পরম্পরা কাঠামো' (Longwe Method), 'অংশগ্রহণমূলক গ্রাম মূল্যায়ন' (Participatory Rural Appraisal), ইত্যাদি। নিচে কিছু বিশ্লেষণী কাঠামোর মূল দিকগুলি তুলে ধরা হলো ঃ

Moser's Gender Planning Framework : মোজারের জেন্ডার পরিকল্পনা কাঠামো

জেন্ডার সচেতন এপ্রেইজাল বা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ক্যারোলিন মোজার উদ্ভাবিত বিশ্লেষণ কাঠামো ব্যবহৃত হয়। এই বিশ্লেষণে বিভিন্ন স্বার্থকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাহিদায় রূপান্তরিত করে এবং সেই চাহিদাসমূহকে মেটানোর জন্য উপযোগী মাধ্যমসমূহকে চিহ্নিত করে জেন্ডার পরিকল্পনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যদি একটি কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ বা অগ্রাধিকারযোগ্য জেন্ডার বিষয় হয়-সমঅধিকারসম্পন্ন সমাজ, তাহলে ব্যবহারিক জেন্ডার চাহিদা হবে জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন বিলুপ্তি।

Harvard Analysis Framework : হার্ভার্ড বিশ্লেষণী কাঠামো

নারী ও পুরুষের শ্রম ও ভূমিকার লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের বিশ্লেষণ সমাজের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কগুলোকে এবং এগুলোর নির্মিতিকে আরো গভীরভাবে দেখতে আমাদের সহায়তা করে। সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাটি একটি কায়েমী অধিকার। যেমন– ভূমি, যন্ত্রপাতি, অন্যান্য সম্পত্তি, শ্রম এবং

লভ্যাংশ; যেমন নগদ অর্থ বা রাজনৈতিক মর্যাদা। এই সকল সম্পদের কিছু কিছুতে নারীর গম্যতা রয়েছে। যেমন– ভূমি। কিন্তু যদি ভূমির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণে কোন ফাঁক থাকে, তবে এই ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজেদের অগ্রগণ্যতা তুলে ধরতে তারা ব্যর্থ হবে এবং ফসলের লাভ তুলতে বাধা পাবে। কারণ নারী সাধারণত পুরুষের তুলনায় বেশি ঘণ্টা কাজ করে, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ-সময়–উপভোগ করতে পারে পুরুষের তুলনায় কম। এ কারণেই সামাজিক সম্পদসমূহ এবং এর লভ্যাংশ, যেমন– শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের ক্ষেত্রে নারীকে বিরত থাকতে হয়– যা নতুন জীবনের ও আয়ের সুযোগ উন্মুক্ত করে।

হার্ভার্ড বিশ্লেষণী কাঠামোতে রয়েছে নারী ও পুরুষের কার্যক্রম-পরিচিতি, সম্পদে ও এর লভ্যাংশে গম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ; আরও রয়েছে এই সমস্ত কিছুর ওপর প্রভাবসৃষ্টিকারী বাহ্যিক উপাদানসমূহ (রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক)। এই উপাদানসমূহ যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্তরে নারী ও পুরুষের ওপর প্রভাব ফেলে-সে পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হার্ভার্ড বিশ্লেষণী কাঠামোটি আমাদের দক্ষ করে তোলে এবং অন্যান্য পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য, যেমন- বয়স, সংস্কৃতি, শ্রেণী ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী করে তোলে।

Capacity and Vulnerability Analysis Framework (CVA): সামর্থ্য ও ভঙ্গুরতা বিশ্লেষণ কাঠামো

সিভিএ-এর উদ্ভব ঘটেছে আশির দশকের শেষভাগে হার্ভার্ডে সমন্বিত আন্তর্জাতিক ত্রাণ/উন্নয়ন প্রকল্প থেকে যেখানে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি এনজিওর সহযোগিতা রয়েছে। সিভিএকে ত্রাণ বা উন্নয়নের কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সিভিএ এদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগশীলতা তুলে ধরে। এই কাঠামো স্বল্প মেয়াদ, নারীর আশু চাহিদা ও সঙ্কটকালে পুরুষ এবং এদের দীর্ঘমেয়াদি দুর্দশাগ্রস্ততার (যা ক্রমে সঙ্কটের দিকে অগ্রসর হয়, এই অবস্থা তাদের সহনশীলতা তৈরি করে দেয় এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করে) মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে। জরুরি ক্ষেত্রে মানুষের ধারণক্ষমতা, যার যে কোন উদ্যোগগ্রহণের কেন্দ্র হওয়া উচিত, সিভিএ কাঠামো তাকে গুরুত্ব দেয়: এই ধারণক্ষমতা হতে পারে সামাজিক, সাংগঠনিক বা সম্পদভিত্তিক এবং সিভিএ এদের সমর্থ করে তোলে, যাতে মানুষ বিপর্যয় থেকে উত্তরণের সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ পায়। এই কাঠামো জেন্ডার

ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য লোপের জন্য কাজ করে এবং এটি কোন প্রকল্প বা কর্মসূচির যে কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হতে পারে।

Longwe Method : লংওয়ের চাহিদা-পরম্পরা কাঠামো

লুসাকার সারা লংওয়ে জাম্বিয়াভিত্তিক জেন্ডার এবং উন্নয়নের একজন বিশেষজ্ঞ। 'নারীর ক্ষমতায়ন-কাঠামো' পদ্ধতিকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর নিজস্ব 'নারীর উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার বিশ্লেষণ পদ্ধতি' প্রবর্তন করেন। জেন্ডার সচেতনতা মানে উন্নয়নচক্রের প্রতিটি স্তরে নারীর ইস্যুগুলোকে সনাক্ত করার দক্ষতা-এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতিটি তৈরি হয়েছে। এই পদ্ধতিতে, উন্নয়ন অর্থে প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর অসমতাগুলো দূর করার ওপর জোর দেয়া বোঝায়। এটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি। সমতা ও ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু তাদের প্রকল্পে এই সদিচ্ছা যথেষ্টভাবে প্রতিফলিত নয়- এধরনের ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

জনমুখী বিশ্লেষণী কাঠামো

এটি হার্ভার্ড কাঠামোভিত্তিক এবং শরণার্থী-কর্মীদের বাস্তব-পরিকল্পনার হাতিয়ার হিসেবে বিন্যস্ত। জরুরি ত্রাণকাজ-যখন জেণ্ডার-বিশ্লেষণের জন্য যে কোন হাতিয়ার বা কাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে, সেখানে শরণার্থীদের জন্য চরম উদ্বেগজনক বিষয়গুলোকে (লোকের ভূমিকার এবং সম্পদের নাটকীয় পরিবর্তন এবং আইনগত ও সামাজিক প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো) জনমুখী কাঠামো তুলে ধরে। এই বিশ্লেষণে ক্ষতির ধারণাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

Gender and Communication : জেন্ডার ও যোগাযোগ

বেইজিং প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশনে ঘোষিত ১২টি প্রধান কর্মকৌশল ক্ষেত্রের (Strategy areas) অন্যতম হলো জেন্ডার ও গণযোগাযোগ। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু হয়ে আজ একুশ শতকের সূচনা অবধি বিশ্বজুড়ে তথ্য বা যোগাযোগ খাতে সূচিত হয়েছে অভাবনীয় অগ্রগতি। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট কেবল থেকে শুরু করে এখন ইন্টারনেট অবধি ছড়িয়ে পড়েছে তথ্যের বন্যা। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন বা চলচ্চিত্রও গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই গণযোগাযোগ মাধ্যমসমূহ নারীর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক উভয় ধরনের ভূমিকাই অত্যন্ত সক্রিয় ও

কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারে। ওয়েবসাইটে পর্নোগ্রাফি, নীলছবি; চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনে নারীর যৌনতার অবাধ ব্যবহার; সংবাদপত্রে ধর্ষণ বা নারীসংক্রান্ত কেলেঙ্কারির গল্প যেমন নারীর নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করে, ঠিক তারই সমান্তরালে জেন্ডার-সংবেদী পরিবেশনা (যেমন, এসিডদগ্ধ নারীদের ব্যাপারে দৈনিক *প্রথম আলোর* গৃহীত সংবাদ নীতিমালা), কার্টুন বা এনিমেশন ছবি (ইউনিসেফের অর্থায়নে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মীনা কার্টুন প্রদর্শনী), জেন্ডারসংবেদী বিজ্ঞাপন, প্রজননস্বাস্থ্য বা নারীশিক্ষা-সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্যচিত্র জেন্ডার-সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Gender and Conflict : জেন্ডার ও সংঘাত

সভ্যতার শুরু থেকেই গোত্রে গোত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা এমন কি একই দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ বা দাঙ্গার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খ্রিষ্টজন্মেরও বহু আগে গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিদিস রচিত 'দ্য ট্রোজান ওমেন'-এ গ্রিক সৈন্যদের যুদ্ধবন্দিনী ও যৌনদাসী ট্রোজান নারীদের যে আর্তি ধ্বনিত হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যদের হাতে ধর্ষিতা কোরীয় নারী, ১৯৪৭-এ ভারত উপমহাদেশের দেশভাগে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দাঙ্গায় ধর্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নারী, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাবাহিনী দ্বারা বাঙালি নারীর সম্ভ্রমহানি, বসনিয়ায় সার্ব সৈন্য দ্বারা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ, মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম মেয়েদের ধর্ষণ, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ২০০১-এর অক্টোবর নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় নারী ধর্ষণের ভেতর দিয়ে সেই আর্তি আজো ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

যুদ্ধ বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নারীকে নিতে হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং গৃহাভ্যন্তর থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্র দায়িত্ব পালন করার পরও সে যুদ্ধ বা সংঘাতের দুর্বলতম শিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রেও তার শরীরকেই তার প্রধান শত্রু বানিয়ে তোলা হয়- যা কখনই পুরুষের ক্ষেত্রে ঘটে না।

Gender and Culture : জেন্ডার ও সংস্কৃতি

একটি জনপদের বা সমাজের সমষ্টিগত জ্ঞান, বিশ্বাস, আইনকানুন, ঐতিহ্যিক প্রথা, রীতিনীতি, ধর্ম, জীবিকা ইত্যাদি মিলেমিশে যে জীবনরূপ তৈরি করে

সেটি সেই সমাজের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রবাহিত হয় চর্চা থেকে অভ্যাসে, অভ্যাস থেকে মানসিকতায়, মানসিকতা থেকে চিন্তায়, চিন্তা থেকে দৃষ্টিভঙ্গিতে, দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আচার-আচরণে। সকল ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি মিশে থাকে মানুষে মানুষে নানা সম্পর্কের গভীরে। এ সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে সেই জনসমষ্টির পরস্পরের শ্রেণী ও ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয় ওই সমাজের রীতিনীতি, ধর্ম, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, প্রথা, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

সমাজের নানা শ্রেণীসম্পর্কের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত সম্পর্ক হলো নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। পরস্পরের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণে সমাজের সদস্য হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তারের কাজ করে। সংস্কৃতির প্রভাবে বা সংস্কৃতির নামে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে জেন্ডার ও সংস্কৃতির আলোচনা দ্বারা তাতে আলোকপাত করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রায় সকল সংস্কৃতিতে নারীর মুক্ত চলাচল নিন্দনীয়, অপরদিকে পুরুষের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকা নিন্দনীয়। প্রাচ্য সংস্কৃতিতে বিয়ে, সন্তানধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। এ ছাড়াও পুত্রপ্রাধান্য, সতীদাহ, স্ত্রী-প্রহার, বিধবাদের খাদ্য ও চালচলন, সতীত্বরক্ষা, স্ত্রী-জননাঙ্গ কর্তন, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, যৌতুকপ্রথা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নারীর ভূমিকা ও পরিচয় ইত্যাদি বৈষম্য সংস্কৃতির আবরণে প্রচলিত।

সংস্কৃতি এভাবে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে যে, নারীর বৈশিষ্ট্যকে ঋণাত্মক এবং পুরুষের বৈশিষ্ট্যকে ধনাত্মক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্নেহশীলতা, আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি ঋণাত্মক হিসেবে নারীর বৈশিষ্ট্য এবং কঠোরতা, যুক্তিবাদ ইত্যাদি ধনাত্মক হিসেবে পুরুষের বৈশিষ্ট্য বলে আমাদের সমাজে গৃহীত। সংস্কৃতির নামে শিশু অবস্থা থেকেই নারীকে নিম্নকণ্ঠ-নিষ্ক্রিয়-পরোক্ষ হতে এবং পুরুষকে উচ্চকণ্ঠ-সক্রিয়-প্রত্যক্ষ হতে শেখানো হয়।

নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজন ও ভূমিকা নির্ধারণে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শব্দ দুটির প্রচলন নারী-পুরুষ সম্পর্কের সাংস্কৃতিক বৈষম্যমূলক দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা এই ঋণাত্মকতার কারণে নারীরা সেবামূলক বা ব্যবস্থাপনার ভূমিকায় (যেমন সেক্রেটারি, নার্স, পরিচারিকা, গৃহিণী, নির্দেশপালনকারী) নির্দিষ্ট হয় আর পুরুষেরা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, উপার্জন করে;

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন, রীতিনীতি ও আইন তৈরি করে এবং নির্দেশ দেয় ইত্যাদি। নারীর কাজের যথাযথ মূল্যায়ন নেই। একই কাজে পুরুষের তুলনায় নারীর মজুরি কম বা অর্থনৈতিক ভূমিকা দুর্বল। যেমন, নারীরা বাড়িতে রান্না করে কিন্তু হোটেলে বাবুর্চি হয় পুরুষেরা; নারীরা বাড়িতে ধোয়াকাচা করে অথচ লন্ড্রিতে কাজ করে পুরুষেরা, নারীরা সেলাই করে কিন্তু দর্জি হয় পুরুষেরা।

নারীকে মূল্যায়ন করা হয় তার সৌন্দর্য ও শরীর দিয়ে। পুরুষকে মূল্যায়ন করা হয় বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়ে। পুরুষ একইসঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে পারে। নারীর ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। অনেক সময় সংস্কৃতি প্রাচীন বিশ্বাস বা ধর্মের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থাৎ ধর্ম যা কোন না কোনভাবে অনুমোদন করে তাই সংস্কৃতিতে পরিগৃহীত হয়। ধর্ম আর সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রেই তাই পরস্পরের পরিপূরক।
সংস্কৃতির শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত এবং সংস্কৃতিজাত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে নারীপুরুষের সমতার ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় বলে জেন্ডার সম্পর্কে ভাবতে গেলে সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়ার অবকাশ নেই। জেন্ডারের ধারণা অনুধাবনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা জেন্ডার-বিষয়ক সকল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণের পেছনে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Gender and Development (GAD) : জেন্ডার ও উন্নয়ন

আশির দশকে Women in Development (WID) এবং Women and Development (WAD)-এর বিকল্প হিসেবে Gender and Development (GAD)-এর তত্ত্বগত ধারণার উদ্ভব ঘটে। GAD-এর তত্ত্বগত ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। সমাজতন্ত্রী নারীবাদীরা সামাজিক গঠন এবং পুনরুৎপাদনকেই নারী-নিপীড়নের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং বিভিন্ন সমাজে পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রচলিত ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

জেন্ডার এবং উন্নয়নের ধারণাটি বুঝতে হলে প্রথমে বিত্তবান ও বিত্তহীন এবং সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সমতাহীন সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রের বিপুল

বৈষম্যের বিষয়টি বুঝতে হবে। সম্পদশালী বা ধনিক শ্রেণী সমাজের সকল সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে বা ভোগ করে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তারা সমাজ-কাঠামো বা ক্ষমতা-কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। সম্পদহীন বা দরিদ্র শ্রেণী এই সমাজ-কাঠামো বা ক্ষমতা-কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা নিপীড়িত হয়। এই পরিস্থিতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। একজন দরিদ্র নারী যেমন শ্রেণীবৈষম্য বা সম্পদবৈষম্যের কারণে ক্ষুধা, অপুষ্টি, আশ্রয়হীনতার শিকার, একজন দরিদ্র পুরুষও একই পরিস্থিতির সমান শিকার। কিন্তু শ্রেণী বা সামাজিক সম্পদ ও ক্ষমতা-নির্বিশেষে সকল নারী আরো এক ধরনের বৈষম্যের শিকার যা থেকে পুরুষ মুক্ত। ধনী অথবা দরিদ্র উভয় নারীই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর শিকার। পুরুষ কেবল সামাজিক ক্ষমতা বা সম্পদ-কাঠামোর বৈষম্যের শিকার, কিন্তু নারী এর পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর শিকার।

নারীর এই দ্বৈত-বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টিই বিশেষভাবে জেন্ডার এবং উন্নয়নের ধারণা বা কার্যক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়। যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি এভাবে জেন্ডার-সচেতন নয় সেগুলি নারীর উপকারের বদলে তাদের আরো বঞ্চিত করে। তাদের জন্য কাজ আরো বাড়িয়ে তোলে এবং প্রজনন ও সামাজিক জীবনে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিতেও ব্যর্থ হয়।
(বিস্তারিত : জেন্ডার উন্নয়নের ইতিহাস)

Gender and Economics : জেন্ডার ও অর্থনীতি

অন্য সকল ক্ষেত্রের মতই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জেন্ডার পরিস্থিতি যাচাই করলে নারী-পুরুষের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী আজ মোট শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ এবং জাতীয় আয়ে প্রায় ৩০ ভাগ অবদান নারীদের। যেখানে প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার প্রায় ৯৮% হিসেবের মধ্যে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭% গণনা করা হয়। এছাড়াও নারীদের গৃহস্থালী কাজকে (Unpaid Labour) অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব-অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদানস্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়- যা পরিমাপ করা হয় না। অন্যদিকে নারীরা পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫ গুণ বেশি গৃহস্থালী কাজের বোঝা বহন করে। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের তিনভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করে কিন্তু মোট আয়ের

১০ ভাগের ১ ভাগ পায়। গোটা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের ৭০ ভাগ নারী এবং তারা বিশ্বের মোট সম্পত্তির মাত্র ১ ভাগের মালিক।

এই বাস্তবতা সত্ত্বেও ইদানীংকালে নারীদের অবদান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিমাপ করা হচ্ছে। যদিও জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় নারীরা এখনও তাদের নায্য মর্যাদার স্থানে উন্নীত হতে পারে নি। পরিকল্পনাবিদরা নারী ইস্যুকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবার ক্ষেত্রে এখনও ততটা সদিচ্ছা এবং জেন্ডার-সচেতনতার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন নি।

জেন্ডার-সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচকের বিচারে ১৭৫টি দেশের মধ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০তম *(Human Development in South Asia 1997)* স্থানে। এর কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ ভোগ ও অধিকার- সকল ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের অবস্থান বৈষম্যমূলক। বাংলাদেশের দরিদ্রতম অংশ হলো নারীসমাজ। সাম্প্রতিক সময়ে ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা-ফোরামে দেখা গেছে সারা বিশ্বে ৬০% নারী শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত, পৃথিবীর ৮৭৩ মিলিয়ন নিরক্ষর মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ নারী। যদিও এখন বহুসংখ্যক নারী ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত, কিন্তু তাদের পুরুষের চেয়ে বেতন কম দেয়া হয়, আর যারা সংসার দেখে, ছেলেমেয়ে মানুষ করে, রান্নাঘর সামলায়, তারা সবই অবৈতনিক কর্মচারী, পেটে-ভাতে খাটে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার নারী-সদস্যের হার মাত্র ৯%। কর্মক্ষেত্রে নারী শারীরিক ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। নারী পাচার এবং দেহব্যবসা-শিল্পে বৎসরে নারীদের দিয়ে আয়ের উৎস ৮ বিলিয়ন ডলার (আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন সংস্থার প্রতিবেদন)। জাতীয় আয়, উৎপাদন, শ্রমশক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত অর্থনীতি এতদিন ছিল আশ্চর্যজনক নীরব। অর্থনীতিতে নারীর অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন তাই আজো হয় নি। জেন্ডার-বৈষম্যের পরিধি শ্রমের বাজার তথা অর্থনীতির ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। চলতি ধারণায় পুরুষ মূলত বিবেচিত হয় শ্রমশক্তি রূপে, ঘরের কাজ বা গৃহশ্রমকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। উন্নত-অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র সকল দেশেই এই চিত্র এখনও দৃশ্যমান।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত অর্থনীতিতে, নারীর ক্রমবর্ধমান অবদান ও ভূমিকা এই গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ড বা গৃহশ্রমের hidden economyকে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়েছে যে কী করে জনসংখ্যার বিরাট

অংশ এই 'লুক্কায়িত অর্থনীতির' ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সংশোধিত জাতীয় আয়ের পরিমাপ (System of National Account- SNA) সমাজে নারীর অদৃশ্য অবদানের (Invisible Contribution) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই হিসেব থেকে দেখা গেছে যে, পরিবারেই ভোগা- এরকম জিনিসের বাজার দাম অনুযায়ী সারা দুনিয়ার মোট ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১১ ট্রিলিয়ন উৎপাদন নারীদের।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীরা সপ্তাহে ৩১-৪২ ঘণ্টা মজুরিহীন গৃহশ্রমে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়। *টাইম অব ইন্ডিয়ার* তথ্যমতে একজন ভারতীয় নারী (গড়ে ৬০ বছর বয়সী) সারা জীবনে গড়ে ৭৩০০০ ঘণ্টা বা ৩০৪১ দিন বা ৮.৩৩ বছর রান্নাঘরে কাটায়। এছাড়াও জাতিসংঘের সমীক্ষায় দেখা যায় চাকরিরত স্ত্রী শুধুমাত্র স্বামীর জন্য সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা বেশি কাজ করেন অথচ স্ত্রী চাকরি করলে স্বামী সপ্তাহে ১/২ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন না। ঘর সামলানোর জন্য চাকরিরত স্ত্রীকে সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা এবং চাকরি না করলে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়। জাতিসংঘের SNA-অনুযায়ী সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দ্রব্যের উৎপাদনভিত্তিক আত্মপোষণশীল (Subsistence) খাত বা অর্থনীতি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। আত্মপোষণশীলতা বলতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও পরিসেবা প্রদানের বিষয়টিকে বোঝান হয়। অধিকাংশ দেশের পুরুষরা প্রত্যক্ষ উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের চাইতে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। কিন্তু আত্মপোষণশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং গৃহকর্মে পুরুষের চাইতে নারীরা অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে। এই খাতে ৬০-৮০ শতাংশ এবং গার্হস্থ্যখাতে ৮৪-৯৫ শতাংশ অবদান হলো নারীর। গড় হিসেবে তাই দেখা যায় যে নারীরা একনাগাড়ে পুরুষের চাইতে দীর্ঘ সময় কাজ করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে মোট শ্রমঘণ্টার ৫৪-৬০ শতাংশ আসে নারীদের সূত্রে।

নারীর স্বীকৃতিহীন, মজুরিবিহীন সাংসারিক কাজকর্ম আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে ঠাঁই পাচ্ছে। শ্রমশক্তির হিসেবের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে সরকারি পরিসংখ্যানে নারী-শ্রমশক্তির সংখ্যা ও হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে গেছে। প্রথাগত সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদেরই বিবেচনা করা হতো যাদের বয়স ১০ বছর বা তার বেশি এবং যারা সপ্তাহে ১৫

ঘন্টার বেশি কাজ করে। এই বিবেচনায় কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশুপালন, ধান মাড়াই বা সেদ্ধ করা ইত্যাদি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। পূর্বের হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ এর শ্রমশক্তি জরিপে মোট শ্রমশক্তি ছিল ৩ কোটি ৯ লাখ, এর মধ্যে পুরুষ-শ্রমশক্তি ছিল ২ কোটি ৭৭ লাখ এবং নারী-শ্রমশক্তি ধরা হতো ৩২ লাখ। নতুন হিসেবে এই চিত্র ব্যাপকভাবে বদলে গেছে। ১৯৮৯ সালের শ্রমশক্তি-জরিপে মোট শ্রমশক্তি দাঁড়ায় ৫ কোটি ৭ লাখ, যেখানে নারী-শ্রমশক্তি ২ কোটি ১০ লাখ। নারী শ্রমশক্তি ৩২ লাখ থেকে ২ কোটিতে উন্নীত হয়ে যায় শুধু কৃষি-সম্পর্কিত মজুরিবিহীন কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায়।

Gender and Environment : জেন্ডার ও পরিবেশ

পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা (Anthropocentric ethics) মনে করে মানুষের কেবল নৈতিক মূল্য আছে, কাজেই আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি দায়িত্ব থাকলেও তা হচ্ছে পরোক্ষ। কারণ মানব কেবল অন্তর্নিহিত মূল্যে মূল্যবান, অন্য কিছু নয়। এমন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে পরিবেশনীতির দার্শনিকদের।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, প্রকৃতির জগতে মানুষের অবাধ বিচরণের অধিকার আছে যদিও প্রকৃতির প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু Aldo Leopold (১৮৮৭-১৯৪৮) তাঁর প্রবন্ধ *"The Land Ethics"*-এ সমাজের এমন ধারণার মূলে কুঠারঘাত করেন। ফলে মানুষের মূল্যবোধের জগতে পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষ এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক-বিষয়ক সুশৃঙ্খল বিবরণ হচ্ছে পরিবেশ-নীতিবিদ্যা। পরিবেশ-নীতিবিদ্যার একটি অংশ হচ্ছে জেন্ডার-সম্পর্কিত আলোচনার সংযোজন। যাকে ১৯৭৪ সালে Francoised Eaubonne বলেন 'Ecofeminism' বা পরিবেশ নারীবাদ। এঁদের মতে নারী ও পরিবেশ অভিন্ন, উভয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো অনুসারে অধস্তন শ্রেণীর।

নারী যেহেতু প্রকৃতির মত নিষ্ক্রিয় এবং মর্যাদাহীন শ্রেণীর বলে বিবেচিত হয়, তাই পুরুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বলয়ের অধীন হয়ে পড়ে। পরিবেশ-

নারীবাদীরা (ওয়ারেন, প্লামউড, মারি, বুকচিন, জিম চেনি) নারী ও প্রকৃতির কতগুলো বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে যেগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বলয় সৃষ্টি করেছে; কিন্তু পরিবেশ নারীবাদীরা একই সাথে এটাও স্বীকার করেন যে নারী ও প্রকৃতির এসব বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব রয়েছে। তবে নারী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজ কাঠামো পুণর্গঠনের দিকটি বিবেচনা করতে হবে এবং সমাজের অন্তর্ভুক্ত পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো ও কর্তৃত্বের যৌক্তিকতার অসারতা তুলে ধরতে হবে।

বেইজিং **Platform for Action** হলো নারী উন্নয়ন নীতিমালার একটি আন্তর্জাতিক গাইডলাইন। এতে চিহ্নিত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কর্মকৌশল রয়েছে যেখানে নারী ও পরিবেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

- সকল স্তরে পরিবেশ-সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণে সক্রিয়ভাবে নারীদের জড়িত করা;
- টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচি ও নীতিমালায় জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিতকে সমন্বিত করা;
- নারীদের উপর উন্নয়ন ও পরিবেশ-সংক্রান্ত নীতিমালার ফলাফল নিরূপণের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যসাধন পদ্ধতি (mechanism) শক্তিশালী করা বা প্রতিষ্ঠিত করা।

Gender and Generation : জেন্ডার ও প্রজন্ম

হাজারো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত তিন শতকে ভারতীয় উপমহাদেশসহ গোটা বিশ্বে নারী এগিয়েছে অনেকটা। ১৭৯২ সালে ওলস্টোনক্রাফটের *এ ভিনডিকেশন অব দ্য রাইটস্ অব ওম্যান* প্রকাশ, ১৮৪০-এ নিউইয়র্কের সেনাকা ফলস অধিবেশন, ১৯৪৪-এ ফ্রান্সে এবং ১৯৪৭-এ ইতালিতে মেয়েদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি, ১৯৩৫ সালে অবিভক্ত বঙ্গীয় আইনসভায় মেয়েদের ভোটাধিকার অর্জন, ব্রিটিশ ভারতে সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধকরণ (১৮২৯), বিধবাবিবাহ প্রবর্তন (১৮৫৫), ১৯৫৫ সালে ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংস্কার, ১৯৬১ সালে পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইন বিধি পাস হওয়া, ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি- এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নারী

এগিয়েছে অনেকটা পথ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নারীর অধিকারসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিও পরিববর্তিত হয়ে চলেছে।

Gender Audit : জেন্ডার নিরীক্ষা

যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বছরের সকল আর্থিক হিসাবনিকাশ নিয়মিত নিরীক্ষা বা Audit করা জরুরি। এই নিরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বাসা বাঁধার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একই রকমের ধারণা থেকে প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সাম্য বা বৈষম্যসংক্রান্ত পরিস্থিতি যাচাই/নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে উন্নয়ন পরিমণ্ডলে জেন্ডার নিরীক্ষা বা Gender Audit-এর উদ্ভব হয়েছে। এর দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কাঠামো থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার-নিরপেক্ষতার বিষয়টি যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়।

সাধারণত নিচের পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করে জেন্ডার নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে :

১. **পরিকল্পনাগত**

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার-নীতিমালা, জেন্ডার ইউনিট, জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট আছে কিনা;
- জেন্ডার-নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে কিনা;
- প্রতিষ্ঠানের কর্মীর কর্মপরিধিতে জেন্ডার-বিষয়ক কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা;
- জেন্ডার-প্রভাব নির্ধারণ ও মূল্যায়নে কোন বিশেষ প্রকল্প রয়েছে কিনা।

২. **ব্যয় সংক্রান্ত**

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গত দু'বছরে জেন্ডার খাতে (যেমন-প্রশিক্ষণ, সচেতনতাবৃদ্ধি, প্রকল্প-মূল্যায়ন, প্রকাশনা, সভা ইত্যাদি) কত ব্যয় করেছে;

৩. **সক্ষমতা-দুর্বলতা যাচাই**

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনায় জেন্ডার-সমতাকে সূচিত করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো সনাক্তকরণ;

৪. প্রশিক্ষণ

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জেন্ডার-ইস্যুতে কোন প্রশিক্ষণ বা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কিনা এবং করে থাকলে কোন পর্যায়ের কর্মীদের জন্য তা করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণের মেয়াদ কত ছিল;

৫. উপকরণ

- গত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত নথি, নীতিমালা এবং যাবতীয় প্রকাশনা জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত থেকে যাচাই করা;

৬. ব্যবস্থাপনা

- চাকুরি প্রদান বা পদোন্নয়নের সময় জেন্ডার-ন্যায়পরতা উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত কিনা;
- শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম অংশীদারিত্ব আছে কিনা;

৭. কর্মসূচি বিষয়ক

- প্রকল্প বা কর্মসূচি নারীর চাহিদাকে সূচিত করেছে কিনা, নারীর অন্তর্ভুক্তির ধরন কেমন ইত্যাদি যাচাই করা।

Gender Awareness : জেন্ডার সচেতনতা

কোন কিছুই যে জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়- সে বিষয়টি উপলব্ধিগত হওয়া জেন্ডার-বিষয়ে সচেতনতার মূল শর্ত। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এমন যে কোন শব্দ, ক্রিয়া বা কাঠামো, লিখিত বক্তব্য, নীতি, পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ থেকেই জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের উদ্ভব ঘটে- এই ধারণার ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে পারার মাধ্যমে জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে।

Gender awareness-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো :

প্রথমত : নারীর ভিন্নতর এবং বিশেষ চাহিদার স্বীকৃতি;

দ্বিতীয়ত : পুরুষের তুলনায় নারীরা একটি সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী (খাদ্য, আয়, চিকিৎসা এবং উৎপাদনের হাতিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রে);

তৃতীয়ত: নারীর উন্নয়নের অনিবার্য পরিণতি সমঅধিকার অর্জন এবং ক্ষমতায়ন।

জেন্ডার সচেতনতা বলতে কেউ কেউ নারীদের চাহিদা ও ইস্যু নিরূপণ এবং যে কোন ইস্যুকে নারীর স্বার্থ ও অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বোঝান। সচেতনতার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই, কারণ যে কোন সমাজে/সংস্কৃতিতে জেন্ডার সম্পর্কের (Gender Relation) বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই সচেতনতা বিচার্য। কারণ স্তরভিত্তিক সমাজের সকল নারী (দরিদ্র থেকে উচ্চবিত্ত) একই গোষ্ঠীর নয়, ফলে তাদের চাহিদার তারতম্য ঘটে কাজ, সম্পদ এবং দায়িত্বের ভিন্নতায়। জেন্ডার সচেতনতার অভাবেই উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর চাহিদা গুরুত্ব পায় না।

উপরিউক্ত মতানুসারে জেন্ডার-সচেতনতা বলতে বোঝায় নারীর ইস্যুকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা এবং প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে নারীর ইস্যুকে বিবেচনায় রাখা।

৫টি মূল নীতিকে সামনে রেখে নারী ইস্যুকে চিহ্নিত করতে হয় :

সমতার মাত্রা (Level of equality)
নিয়ন্ত্রণ (Control)
অংশগ্রহণ (Participation)
প্রচেতনীকরণ (Conscientisation)
গম্যতা (Access)
কল্যাণ (Welfare)

কল্যাণ বলতে পুরুষের সমান খাদ্য, অর্থ ও চিকিৎসা সুবিধাদি নারী পায় কিনা এবং জমি, শ্রম, প্রশিক্ষণ, আর্থিক বাজারে পুরুষের সমঅধিকার পেয়েছে কিনা সেটাই তার অধিকারের মাত্রা নির্দেশ করে।

প্রচেতনীকরণ হলো লিঙ্গ-ভূমিকা ও জেন্ডার-ভূমিকার মধ্যকার পার্থক্য বুঝবার ক্ষমতা। যৌন-সমতায় বিশ্বাসী (Belief in sexual equality) হওয়া জেন্ডার-সচেতনতার মূল ভিত্তি এবং এ বিশ্বাস দ্বারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর সমষ্টিগত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

অংশগ্রহণ হলো সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায়, নীতি-নির্ধারণে, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণক্ষেত্রে সমতা হলো নারী-পুরুষের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা যা কাউকেই কর্তৃত্বের অবস্থানে নেয় না।

Gender Balance : নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণ

Gender Balance বা নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণ বলতে সাধারণত কোন সংগঠন/প্রতিষ্ঠান বা কোন কর্মকাণ্ডে সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ বোঝায়। যেমন কোন কমিটিতে বা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কাঠামোয় নারী ও পুরুষের প্রতিনিধিত্ব সমান কিনা তা লক্ষ রাখা।

Gender Bias : লিঙ্গীয় পক্ষপাত

নারী ও পুরুষকে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক সকল ভূমিকায় কেবল নারী বা কেবল পুরুষ হিসেবে বিবেচনার প্রবণতাই হলো Gender Bias বা লিঙ্গ পক্ষপাত। এই প্রবণতার অর্থ হলো- মানুষের শক্তি বা ভূমিকাকে তার লিঙ্গ দ্বারা যাচাইয়ের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ বা অতিরঞ্জিত করার প্রচেষ্টা।

Gender Blind : জেন্ডার নিশ্চেতন

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ প্রকৃতিসম্পন্ন, নির্দোষ এবং জেন্ডার নিরপেক্ষ ব্যাপার বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতভাবে বিবেচনা করলে বোঝা যায় সেগুলি পুরুষপ্রবণতাধর্মী। জেন্ডার নিশ্চেতনের ধারণাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

একজন Colour blind বা বর্ণান্ধ ব্যক্তির দৃষ্টির জগতে যে কোন বিশেষ রঙের অনুপস্থিতি রয়েছে। অর্থাৎ সে কোন একটি বা একাধিক রঙ দেখতে পায় না। জেন্ডার নিশ্চেতন ব্যক্তিও সমাজজীবনে জেন্ডারের বৈষম্য দেখতে পায় না। বর্ণান্ধ ব্যক্তির এই সীমাবদ্ধতা অপরিবর্তনীয়; কেননা এটি তার জন্মগত। জেন্ডার নিশ্চেতনের সীমাবদ্ধতা অপরিবর্তনীয় নয়; তবে জেন্ডারনিরপেক্ষ দৃষ্টি অর্জনের জন্য তার মনন নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন একটি উচ্চাঙ্গ শিল্পের রস গ্রহণ করার জন্য চেতনা তৈরি করতে হয়, তেমনি সমাজজীবনে জেন্ডারের বৈষম্যমূলকরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্যও চেতনা তৈরি করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পুনরুৎপাদনধর্মী কাজসমূহ কেবল নারীর জন্য নির্ধারিত এবং উৎপাদনমূলক কাজ বা উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের জন্য নির্ধারিত- এই ব্যবস্থাটি সম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে কোন প্রশ্ন উদয় হয় না, সে জেন্ডার নিশ্চেতন ব্যক্তি।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, জেন্ডার সচেতন ব্যক্তি সেই বৈষম্যের স্বরূপ বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে। জেন্ডার নিশ্চেতন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাটি স্বাভাবিক, চিরাচরিত ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে গ্রহণ করে। কোন অন্যায় দেখতে পায় না। জেন্ডার নিশ্চেতন ব্যক্তির চেতনায় সমাজের একাংশের চাহিদা সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে বলে সেই বিষয়ে সে নিশ্চেতন।

Gender Disaggregation of Data : জেন্ডার/ লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লিষ্টকরণ

এখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম বা অন্যান্য প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের কাজে নারীর পরিবেশ, সংস্কৃতি, অবস্থানগত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা হয় না। ফলে প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত না হয়ে তাতে অনেক তথ্যগত বিভ্রান্তি থেকে যায়। জেন্ডার/লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য হলো- শ্রেণী, গোত্র, বয়স, স্থান, পরিবেশ নির্বিশেষে নারী ও পুরুষের সকল কর্মকাণ্ডের তথ্য ভিন্নভাবে সংগ্রহ করা। কেননা নারী ও পুরুষ সকল সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে যা তাদের সামর্থ্যের ক্ষেত্রেও ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

Gender Discrimination : নারী-পুরুষ বৈষম্য

নারী ও পুরুষকে তাদের জৈবিক সত্তার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা ও সেইভাবে আচরণ করা। শ্রেণীবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে এক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য, জেন্ডার বৈষম্যও একইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য। এই শ্রেণীটি হলো পুরুষ শ্রেণী। সারা পৃথিবীতে শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রায় সকল পুরুষের নারীকে শোষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। বৈষম্যভিত্তিক এই সম্পর্কটি ব্যাপ্ত রয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে। বৈষম্যটি টিকিয়ে রাখা হয়েছে আইন, প্রথা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে। বৈষম্য নিশ্চিত করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। প্রক্রিয়াটি এমন যে- জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'বেশি দেয় কম নেয় /স্বল্পে তুষ্ট/ প্রতিবাদহীন/পরোক্ষ' যে নারী তাকে 'ভাল নারী' হিসেবে সমাজ স্বীকৃতি দেয়। সমাজের চোখে 'ভাল' হওয়া বা থাকার জন্য নারী নিজেই এই প্রক্রিয়াটিকে ধারণ করে, লালন করে এবং বহন করে। সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন হলেও সকল কাঠামোতে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য যেমন ছিল ও আছে, তেমনি নারী-পুরুষ বৈষম্যও ছিল ও আছে।

অসম জেন্ডার সম্পর্ক যখন আইন, নীতি বা মূল্যবোধের মাধ্যমে বৈধ করা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়, অপরিবর্তনীয় প্রথা হিসেবে চালু করা হয়, তখন সেটি বৈষম্য হিসেবে রূপ গ্রহণ করে। বৈষম্য সরাসরি কাজ করে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ওপর।

Gender Equality : জেন্ডার সমতা

নারী ও পুরুষের শারীরিক পার্থক্য বিবেচনার বাইরে তাদের সমান অবস্থান অর্জনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত নিয়ম, ধারণা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নেয়া। অর্থাৎ নারী-পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সীমাবদ্ধতাগুলিকে বিবেচনা করা।

জেন্ডার-সমতা- এ শব্দবন্ধটি দিয়ে কেবল নারী বা কেবল পুরুষের অধিকারের বিষয় বোঝায় না। মৌলিক/সাংবিধানিক/সামাজিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিমাণগত ও গুণগত অবস্থান সমান হলে এবং এই সমতা আইনসম্মত (অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ভোগের বিষয়টি আইনে রূপান্তরিত বা পরিগণিত হওয়া) হলে সমাজে যে অবস্থা তৈরি হবে তাকে জেন্ডার সমতা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্র তার সকল সদস্য/নাগরিককে যে সকল অধিকার ও সুযোগ প্রদান করেছে তা নারী ও পুরুষ সমভাবে ভোগ করতে পারলে জেন্ডার সমতা তৈরি হবে।

Gender Equity : জেন্ডার ন্যায়পরতা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর গম্যতার ক্ষেত্রে সাম্যকে জেন্ডার ন্যায়পরতা বা Gender Equity হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন সাধারণ চিত্র এই যে, শিশুটি ছেলে না মেয়ে তার ওপর নির্ভর করে তার শিক্ষালাভের অধিকার। Gender Equity এমন একটি অবস্থা যেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পদে সমান গম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

জেন্ডার সমতার স্বাভাবিক পরিণতি বা ফলাফল হলো জেন্ডার ন্যায়পরতা। জেন্ডার ন্যায়পরতা বোঝার জন্য শেয়াল ও সারসের উদাহরণটি উল্লেখ করা যেতে পারে। শেয়াল ও সারসকে সমান ধরনের পাত্রে সমান খাবার দেয়া হয়েছে এবং খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও দুজনকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও শেয়াল আর সারসের খাদ্য গ্রহণে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

কেননা সারসের ঠোঁটের প্রকৃতি অনুযায়ী তার প্রয়োজন লম্বা গলার কলস ধরনের পাত্র এবং শেয়ালের চোয়ালের প্রকৃতি অনুযায়ী তার প্রয়োজন চ্যাপ্টা থালা ধরনের পাত্র। শেয়াল আর সারসের চোয়াল ও ঠোঁটের গঠন অনুযায়ী তাদের পাত্রের চাহিদাও ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে শেয়াল ও সারসের প্রতি ন্যায়পরতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে; যখন শেয়ালের চাহিদা অনুযায়ী চ্যাপ্টা পাত্রে আর সারসের চাহিদা অনুযায়ী লম্বা পাত্রে তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হবে। একইভাবে জেন্ডার ন্যায়পরতা নারী ও পুরুষের চাহিদা পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করে। জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে জেন্ডার ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

Gender in Development Programme : উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার এবং History of Gender and Development : জেন্ডার ও উন্নয়নের ইতিহাস

জেন্ডার একটি পুরাতন শব্দ যা নূতন অর্থ গ্রহণ করেছে। মানুষ নারী অথবা পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে; পুরুষ সন্তান জন্মায়, নারী সন্তান ধারণ করে, জন্ম দেয় এবং মানবশিশুকে স্তন্যপান করায়। এই শারীরিক পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে আমরা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ড তৈরি করি- এগুলিই আমাদের জেন্ডারের ভূমিকা এবং পরিচয়।

নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার ভূমিকা ও দায়িত্বের কারণে তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদাও ভিন্ন হয়। নারী এবং পুরুষ উভয়ই উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং কমিউনিটি জীবনে ভূমিকা পালন করে কিন্তু নারীর অবদান হয়ত কম আনুষ্ঠানিক। পুরুষের কৃষিকাজের ফল দাঁড়ায় নগদ উপার্জন; পরিবারের জন্য নারীর খাদ্য উৎপাদনের মূল্য লুক্কায়িত থাকে।

নারীর কাজের কোন মূল্যায়ন হয় নি এবং কখনও কখনও পরিণাম ভয়াবহ হলেও উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জল- ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কাজে নারীর ভূমিকা বিবেচনায় না রেখে পরিকল্পনা করার ফলে কারিগরি দিক থেকে ত্রুটিহীন হলেও সামাজিক অদক্ষতা থাকায় জল সরবরাহ প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। কারণ নারীর পক্ষে বিপুল কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে করে দিনের একটি অনুপযুক্ত সময়ে দূর থেকে জল বহন করে আনা অসম্ভব।

নারীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তনের জন্য কিছু উন্নয়ন-কর্মসূচিতে তাদের চাহিদা বিবেচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানের ফলে উদ্ভূত নারীর সামাজিক অবস্থানের ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এইসব চাহিদা কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে? যা কিছু তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেই সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ জরুরি, এটা কমিউনিটি উন্নয়নের মৌলিক শর্ত। এর অর্থ হলো নারী ও পুরুষ সকলের সঙ্গেই আলোচনা করা জরুরি এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করতে হবে।

নারী এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সংক্রান্ত ইস্যুগুলি বহুবছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। উন্নয়নে নারীর অবস্থান এবং জেন্ডার ভূমিকা বিষয়ক ধারণার উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে কাজের ধরনও পাল্টেছে। যদিও ১৯৪৫-এর জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৪৮-এর জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে; তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়ন পরিকল্পক বা কর্মীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নিয়ে যথাযথভাবে কাজ করে নি। অনেক গবেষক দেখিয়েছেন, উন্নয়ন পরিকল্পকরা এই অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করেন যে, সমাজের এক অংশ (পুরুষ) উপকৃত হলে তার ফল অন্য অংশের (নারী) কাছে পৌঁছবে। বছরের পর বছর ধরে উন্নয়নে নারীর অবস্থান নির্ণয়করণ প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫০-৬০-এ উন্নয়নে নারীর ইস্যুকে মানবাধিকারের ইস্যু হিসেবে দেখা হতো। নারীকে রক্ষা করতে হবে বা তার জন্য সুপারিশমালা তৈরি করতে হবে ঠিকই, কিন্তু সে জন্য নারীর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই- ব্যাপারটি ছিল এরকম।

সত্তরের দশকে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় নারীর বিশেষ অবস্থানের স্বীকৃতি ঘটতে শুরু করে, বিশেষ করে জনসংখ্যা ও খাদ্যসংক্রান্ত ইস্যুতে, যদিও নারীর সঙ্গে এসব ব্যাপারে তেমন আলোচনা করা হতো না। এই ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলি আরো সার্থক ও দক্ষভাবে পরিচালিত হবে যদি নারীর মত একটি পরিসম্পদকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়- ব্যাপারগুলিকে এভাবেই দেখা হতো।

১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত ১৯৭২-এ নেয়া হয়, যা পরে জাতিসংঘের নারী-দশকে পরিণতি পায়। প্রতিটি বিশ্ব নারী সম্মেলন দুটি সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত থাকে- একটি সরকারি ও অপরটি

বেসরকারি প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে এবং সকল সেক্টরের উপকারভোগী ও এজেন্ট হিসেবে দেখার প্রবণতা ১৯৮০-তে এসে বাড়তে শুরু করে। এটা অংশত জেন্ডার ভূমিকা বোঝার মধ্য দিয়ে ঘটতে থাকে।

১৯৮৫-তে জাতিসংঘ-দশক চলাকালে নাইরোবিতে একটি সম্মেলন হয় যেখানে, সারা পৃথিবী থেকে নারীরা অংশ নেয়। এখানে ব্যাপক আলোচনার পর 'সামনে তাকাও' কৌশল (Forward-Looking Strategy) গৃহীত হয়। এই 'সামনে তাকাও' কৌশলের আওতায় নারী-দশকের প্রধান বিষয়গুলি (সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি, এবং উপ-বিষয় হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ক্ষেত্রগুলিতে নারী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তা চিহ্নিত করা হয় এবং তা থেকে উত্তরণের কৌশলও স্থির করা হয়। এছাড়া নারীর সমতালাভের জন্য সকল ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সরকার ও অন্যান্যদের জন্য সুপারিশমালাও তৈরি করা হয়।

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। সম্মেলনের মুল লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে নারী- উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র পর্যালোচনা। এ সম্মেলনে ১৯০টিরও বেশি দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এটি প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন নামে পরিচিত। ৩৮টি ধারা- সংবলিত বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা মূলত সরকারের অঙ্গীকারনামা। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুলোর অঙ্গীকার বা সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছে কর্মপরিকল্পনাটি। বেইজিং ঘোষণার অঙ্গীকারপূরণের দায়িত্ব সরকারসমূহের এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারি, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের।

বেইজিং পরিকল্পনায় ১২টি বিষয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

১. নারী ও দারিদ্র্য;
২. নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
৩. নারী ও স্বাস্থ্য;
৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা;

নারীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তনের জন্য কিছু উন্নয়ন-কর্মসূচিতে তাদের চাহিদা বিবেচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানের ফলে উদ্ভূত নারীর সামাজিক অবস্থানের ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এইসব চাহিদা কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে? যা কিছু তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেই সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ জরুরি, এটা কমিউনিটি উন্নয়নের মৌলিক শর্ত। এর অর্থ হলো নারী ও পুরুষ সকলের সঙ্গেই আলোচনা করা জরুরি এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করতে হবে।

নারী এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সংক্রান্ত ইস্যুগুলি বহুবছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। উন্নয়নে নারীর অবস্থান এবং জেন্ডার ভূমিকা বিষয়ক ধারণার উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে কাজের ধরনও পাল্টেছে। যদিও ১৯৪৫-এর জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৪৮-এর জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে; তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়ন পরিকল্পক বা কর্মীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নিয়ে যথাযথভাবে কাজ করে নি। অনেক গবেষক দেখিয়েছেন, উন্নয়ন পরিকল্পকরা এই অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করেন যে, সমাজের এক অংশ (পুরুষ) উপকৃত হলে তার ফল অন্য অংশের (নারী) কাছে পৌছবে। বছরের পর বছর ধরে উন্নয়নে নারীর অবস্থান নির্ণয়করণ প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫০-৬০-এ উন্নয়নে নারীর ইস্যুকে মানবাধিকারের ইস্যু হিসেবে দেখা হতো। নারীকে রক্ষা করতে হবে বা তার জন্য সুপারিশমালা তৈরি করতে হবে ঠিকই, কিন্তু সে জন্য নারীর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই- ব্যাপারটি ছিল এরকম।

সত্তরের দশকে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় নারীর বিশেষ অবস্থানের স্বীকৃতি ঘটতে শুরু করে, বিশেষ করে জনসংখ্যা ও খাদ্যসংক্রান্ত ইস্যুতে, যদিও নারীর সঙ্গে এসব ব্যাপারে তেমন আলোচনা করা হতো না। এই ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলি আরো সার্থক ও দক্ষভাবে পরিচালিত হবে যদি নারীর মত একটি পরিসম্পদকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়- ব্যাপারগুলিকে এভাবেই দেখা হতো।

১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত ১৯৭২-এ নেয়া হয়, যা পরে জাতিসংঘের নারী-দশকে পরিণতি পায়। প্রতিটি বিশ্ব নারী সম্মেলন দুটি সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত থাকে- একটি সরকারি ও অপরটি

বেসরকারি প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে এবং সকল সেক্টরের উপকারভোগী ও এজেন্ট হিসেবে দেখার প্রবণতা ১৯৮০-তে এসে বাড়তে শুরু করে। এটা অংশত জেন্ডার ভূমিকা বোঝার মধ্য দিয়ে ঘটতে থাকে।

১৯৮৫-তে জাতিসংঘ-দশক চলাকালে নাইরোবিতে একটি সম্মেলন হয় যেখানে, সারা পৃথিবী থেকে নারীরা অংশ নেয়। এখানে ব্যাপক আলোচনার পর 'সামনে তাকাও' কৌশল (Forward-Looking Strategy) গৃহীত হয়। এই 'সামনে তাকাও' কৌশলের আওতায় নারী-দশকের প্রধান বিষয়গুলি (সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি, এবং উপ-বিষয় হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ক্ষেত্রগুলিতে নারী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তা চিহ্নিত করা হয় এবং তা থেকে উত্তরণের কৌশলও স্থির করা হয়। এছাড়া নারীর সমতালাভের জন্য সকল ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সরকার ও অন্যান্যদের জন্য সুপারিশমালাও তৈরি করা হয়।

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। সম্মেলনের মুল লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে নারী- উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র পর্যালোচনা। এ সম্মেলনে ১৯০টিরও বেশি দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এটি প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন নামে পরিচিত। ৩৮টি ধারা- সংবলিত বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা মূলত সরকারের অঙ্গীকারনামা। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুলোর অঙ্গীকার বা সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছে কর্মপরিকল্পনাটি। বেইজিং ঘোষণার অঙ্গীকারপূরণের দায়িত্ব সরকারসমূহের এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারি, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের।

বেইজিং পরিকল্পনায় ১২টি বিষয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

১. নারী ও দারিদ্র্য;
২. নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
৩. নারী ও স্বাস্থ্য;
৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা;

৫. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত;
৬. নারী ও অর্থনীতি;
৭. সমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী;
৮. নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;
৯. নারীর মানবাধিকার;
১০. নারী ও গণমাধ্যম;
১১. নারী ও পরিবেশ;
১২. কন্যাশিশু।

৩৬২ অধ্যায় সংবলিত এই দলিল বা বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বা প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (সংক্ষেপে বিপিএফএ বা পিএফএ) এই ১২টি বিষয়কে নারীর উন্নয়ন, সমতা ও বিকাশের বাধা হিসাবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের জন্য কর্মকৌশল ও সরকারি-বেসরকারি স্তরের সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে অগ্রমুখী কৌশলসমূহ ও পিএফএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য (বা ব্যর্থতা) পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশন আয়োজনের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে নাইরোবী এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং নারীর মর্যাদাবিষয়ক কমিশন শীর্ষক একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিশন ১৯৯৮-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পিএফএ বাস্তবায়ন-পর্যালোচনার জন্য জুন ২০০০-এ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনকে সামনে রেখে ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় এবং জাতীয় ও অঞ্চলভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু এবং বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯-এ জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা এবং বেইজিং ঘোষণা ও পিএফএ-র আঞ্চলিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃসরকার কমিশন (ESCAP) আঞ্চলিক পর্যায়ে সভা আয়োজন করে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে আন্তঃসরকার পর্যায়ে এ ধরনের সভা আয়োজন করে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE) ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের অর্থনৈতিক কমিশন (ECLAC) ওই অঞ্চলের আন্তঃসরকার পর্যায়ে একই ধরনের সভা আয়োজন করে। ২০০০ সালের নারী : একবিংশ শতাব্দীতে জেন্ডার সমতা উন্নয়ন ও শান্তি' (Women 2000 : Gender Equality Development & Peace for the twenty first century) শীর্ষক জাতিসংঘের বিশেষ

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালের ৫-৯ জুন। বেইজিং সম্মেলনের পরবর্তী পাঁচ বছরের মূল্যায়ন বেইজিং প্লাস ফাইভ নামে পরিচিত। এই অধিবেশনের ফলাফল নিয়ে বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত বেইজিং প্লাস ফাইভের বিশেষ সভায় দক্ষিণ এশিয়ায় পিএফএ বাস্তবায়ন-মূল্যায়নে যে সকল সুপারিশ গুরুত্ব পেয়েছে, তা হলো-

- সরকার, এনজিও ও সিভিল সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

- উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে পিএফএ-বাস্তবায়নে অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে পরিবীক্ষণ-সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল উল্লেখযোগ্য পরিলক্ষণ। এ ক্ষেত্রে (দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে) মানবসম্পদ-উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসেবে গৃহীত হয়;
- পিএফএ-বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও প্রচলিত মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পিএফএ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের নারীমুখী বা নারীকেন্দ্রিক ধারণা যথেষ্ট স্বচ্ছ না হলে জেন্ডার-সমতার ধারণাটিকে মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন বলে অনুমান করা যেতে পারে। সে কারণে পিএফএ-বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন একটি প্রধান ও আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বেইজিং প্লাস ফাইভের বিশেষ অধিবেশনে দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পিএফএর ইস্যুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ইস্যু হিসেবে ৫টি ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছে :

- নারীর প্রতি সহিংসতা/সশস্ত্র সংঘাত;
- নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন;
- দারিদ্র্য;
- এবং কন্যাশিশু ইস্যুটিকে ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গত শতকের প্রায় শেষ পঁচিশ বছরে বিশ্বের নানা দেশে নারী-পুরুষের মধ্যেকার অবস্থান ও মর্যাদাগত বৈষম্যের কারণে নারী-অধিকার তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি উন্নয়ন-ক্ষেত্রের মূল সমস্যা হিসাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে থাকে। একই সাথে নারীর প্রতি মধ্যযুগীয় সহিংসতা ও

নির্যাতনবৃদ্ধিও বিশ্ব বিবেককে উদ্বিগ্ন করে তোলে ও তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বেইজিং প্লাস ফাইভ এই প্রয়াসে সর্বশেষ কার্যসূচি।

জাতিসংঘ আয়োজিত বেইজিং প্লাস ফাইভ (২রা জুন - ১০ই জুন ২০০১) **সম্পর্কে কিছু তথ্য** : ২০০১ সালের জুন মাসের ২ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের বিশেষ সাধারণ সভা। এ সভার বিষয়বস্তু ছিল '২০০০ সালে নারী : একুশ শতকে জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'। এই বিশেষ অধিবেশনের সভাটিকেই সংক্ষেপে বেইজিং প্লাস ফাইভ বলা হয়ে থাকে। বেইজিং প্লাস ফাইভ সভার মূল অধিবেশনের অসংখ্য সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা আলোচনা সভায় বিশ্বের নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এ কাজটি করার জন্য বিভিন্ন দেশে জাতীয়, আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সভা- সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সরকারি, বেসরকারি প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের নারীসংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত, রিপোর্টের সংকলন করেন, সরকারি/বেসরকারি/বিকল্প রিপোর্ট প্রণয়ন করেন ও তা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সর্বশেষে একটি বৈশ্বিক রিপোর্টে গ্রন্থিত করেন।

বেইজিং প্লাস ফাইভের মূল উদ্দেশ্য

১. ১২টি চিহ্নিত ইস্যুর ক্ষেত্রে নারীসমস্যা-নিরসনে কী অগ্রগতি হয়েছে তার পর্যালোচনা করা;
২. নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছোতে কতটুকু বাকি আছে, তা জানা;
৩. নারী-উন্নয়ন ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয় করা;
৪. অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী, তা নির্ণয় করা;
৫. প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে ও লক্ষ্য অর্জনের কলাকৌশলগুলি কী হবে, এবং তা বাস্তবায়নের সময়সীমাসমূহ নির্ধারণ করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতোপূর্বে বেইজিং ঘোষণায় পিএফএতে বর্ণিত নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা চিহ্নিত হলেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ছিল না; অভাব ছিল সময়সীমাসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার।

Gender Mainstreaming : মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ

নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের সকল নীতি, সিদ্ধান্ত, কর্মপরিকল্পনা, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গ্রহণ ও প্রতিফলনের ব্যবস্থা

নিশ্চিতকরণ হলো জেন্ডারের মূলধারায় সংশ্লেষণ। আরো সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডারমূলধারায় সংশ্লেষণ বলতে বোঝায়-সংগঠনের সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ কাঠামোয় এবং সকল কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সমতার ধারণা প্রায়োগিকভাবে নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া ও তার ফলাফল নিয়মিতভাবে যাচাই করা। এটি উন্নয়নের একটি কৌশল হিসেবে গৃহীত। এই প্রক্রিয়ায় নারী উন্নয়নকে প্রান্তিক বিবেচনায় না রেখে উন্নয়নের মূলধারায় প্রতিস্থাপিত করা হয়।

এই কৌশল প্রক্রিয়া যে কোন পর্যায়ের ও স্তরের যে কোন পরিকল্পিত কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের সম্পৃক্ততা নির্ধারণ করে। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের ও সকল স্তরের পরিকল্পিত কার্যক্রমে অর্থাৎ উন্নয়ন-পরিকল্পনা, আইন, নীতি, কর্মসূচি ইত্যাদিতে নারী ও পুরুষের সমান সম্পৃক্ততা (অর্থাৎ সম্পদের অধিকার/নিয়ন্ত্রণ, সুযোগ ও সুফল ভোগ ইত্যাদি) নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়াকে মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজজীবনের সব ক্ষেত্রে সকল নীতি ও কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে নারী ও পুরুষ উভয়ের মতামত ও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব দেয়।

এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ রাখে, প্রতিষ্ঠান/রাষ্ট্রের যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের ভূমিকা যেন সমাজে থাকে। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি করে 'মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ' তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

'মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ'-এর উদ্দেশ্য হলো নারী ও পুরুষের সমতাসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথা ও মূল্যবোধরূপে যে বাধাগুলো আছে, সেগুলো অপসারণ করে অর্থবহ গণতন্ত্র এবং ন্যায় ও অংশগ্রহণমূলক সমাজের সৃষ্টি অর্থাৎ সমাজজীবনের মূলধারায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ' দুটো বিষয় বিবেচনা করে।

প্রথমটি হলো- কোন নীতির কাঠামো এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া জনসংখ্যার অর্ধেকাংশের মতামত/অংশগ্রহণকে অগ্রাহ্য করলে আইনসম্মত হয় না এবং দ্বিতীয়টি হলো- নারীর (অগ্রাহ্যকৃত মানব-সম্পদ হিসেবে) পরিপ্রেক্ষিত, জ্ঞান, দক্ষতা যা বিভিন্ন মূল্যবোধ, নিয়মনীতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা রাষ্ট্রীয় মানবসম্পদ বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে পুষ্ট করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

'মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ'- এই প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়। 'মূলধারায় জেন্ডার সংশ্লেষণ' তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়, তা হলো- জেন্ডার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি ও দৃষ্টিভঙ্গিজাত আচরণ পরিবর্তন, (নারী ও পুরুষের জীবনধারায় উন্নয়নের প্রভাব পরিমাপের Gender desegregated data জন্য উপাত্তের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লিষ্টকরণ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা, উন্নয়নের সুফল ভোগ করার জন্য দক্ষতা (বিশ্লেষণী দক্ষতা, যোগাযোগ/ এডভোকেসি দক্ষতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ-দক্ষতা ইত্যাদি) বৃদ্ধি।

Gender Need : জেন্ডার চাহিদা

নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে নারীর যা প্রয়োজন বা চাহিদা তাকেই জেন্ডার চাহিদা বলা হয়। জেন্ডার চাহিদাকে মূলত নারীর 'বাস্তব চাহিদা' ও 'কৌশলগত চাহিদা' দ্বারাই বোঝানো হয় এবং নারীর বাস্তব চাহিদা ও কৌশলগত চাহিদা বলতে নারীর অবস্থা ও অবস্থানকে নির্দেশ করা হয়।

নারীর যে চাহিদা স্বল্পমেয়াদি তাকে বাস্তব চাহিদা বলে। বাস্তব চাহিদা দিয়ে নারীর অবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ তার কাজ, জীবনযাপনের অবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়। বাস্তব চাহিদা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সূচিত করা সম্ভব। নারী নিজেই এই চাহিদা নিরূপণ করতে পারে। বাস্তব চাহিদা মিটলে সমাজ-নির্ধারিত নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন সহজতর হয়। যেমন মাটির চুলার পরিবর্তে গ্যাসের চুলা, দূরবর্তী জলাশয়ের পরিবর্তে বাড়িসংলগ্ন টিউবওয়েল থেকে জলসংগ্রহ।

যে চাহিদা দীর্ঘমেয়াদি তাকে কৌশলগত চাহিদা বলে। কৌশলগত চাহিদা দিয়ে নারীর অবস্থানকে বোঝায়। অর্থাৎ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, তার অধস্তনতা হ্রাস ইত্যাদি। কৌশলগত চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথা। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে কৌশলগত চাহিদাপূরণ সম্ভব নয়। বাস্তব চাহিদার মতো কৌশলগত চাহিদা নারী নিরূপণ করতে পারে না। কৌশলগত চাহিদা নারীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়। কেননা সমাজে নারী এমন অবস্থানে রয়েছে যে এই চাহিদা তারা বোধ করতে জানে না। নারীর বাস্তব চাহিদা মিটলে অর্থাৎ তার অবস্থার পরিবর্তন হলেই কৌশলগত চাহিদা পূরণ হয় না কিংবা তার অবস্থানের

পরিবর্তন ঘটে না। নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য উভয় চাহিদাই পূরণ করতে হয়। তবে নারীর কৌশলগত চাহিদা মিটলে তার স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে বাস্তব চাহিদা পূর্ণ হয়। কৌশলগত চাহিদা নিরূপণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব।

Gender Neutral : জেন্ডার নিরপেক্ষ

অধিকারের প্রশ্নে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য সকল ক্ষেত্রে প্রবলভাবে বিদ্যমান, তা জানা সত্ত্বেও যারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলে তারা পরোক্ষভাবে জেন্ডার বৈষম্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে বলে এই শব্দবন্ধ দ্বারা বোঝান হয়। নারীর জন্য বা তার পক্ষে ইতিবাচক বৈষম্য (Positive discrimination) সমর্থন না করাকে জেন্ডার-নিরপেক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Gender Oppression : লৈঙ্গিক নিপীড়ন

যা কিছু নারীসুলভ তার কোনটাই মূল্যায়নযোগ্য নয়- সচেতন বা অবচেতন স্তরের এই ধারণা থেকেই প্রধানত লৈঙ্গিক নিপীড়ন ঘটে থাকে। লৈঙ্গিক কারণে নিপীড়নের অভিজ্ঞতা নারী ও পুরুষ উভয়েরই থাকতে পারে। তবে যেহেতু আমাদের সমাজ পুরুষশাসিত রীতিনীতি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত, তাই এই নিপীড়নের অভিজ্ঞতা পুরুষের তুলনায় নারীর অনেক বেশি এবং তার মাত্রা ভয়াবহ।

Gender Perspective : জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

যে কোন আচরণ, ঘটনা ও কর্মকাণ্ডকে নারী-পুরুষ-সমতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা বা মূল্যায়ন করা অথবা জেন্ডারের দৃষ্টিভঙ্গিজাত ভিত্তি রচনা করাকে জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত বা Gender Perspective নির্মাণ বলা যেতে পারে।

Gender Planning : জেন্ডার পরিকল্পনা

যে সকল পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে সকল পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের সমঅধিকার ও সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে অর্জনের উদ্দেশ্য সন্নিবেশিত থাকলে তাকে জেন্ডার পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে।

জেন্ডার পরিকল্পনা নারী ও পুরুষকে উন্নয়নের সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে এবং উভয়ের অবস্থানের মধ্যের পার্থক্য হ্রাস করে। জেন্ডার

পরিকল্পনা নারী ও পুরুষের কাজ হিসেবে শ্রম বিভাজন করে না, বরঞ্চ নারীর চিরাচরিত ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তার অধস্তনতা ও অধীনস্থতার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলে। অর্থাৎ কর্মসূচি ও অর্থ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সমান মর্যাদা ও মজুরি থাকে।

সমাজে নারী ও পুরুষ কেবল অসম ভূমিকাই পালন করে না, সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণও সমান নয়। সুতরাং নারী ও পুরুষের চাহিদাও এক নয়। নারীর কাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য- কোনটাই নেই। অপরদিকে পুরুষের কাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য দুটোই আছে। ফলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ লাভ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিরাজমান। এ পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের উন্নয়নের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন হয়।

জেন্ডার পরিকল্পনা নারীর বাস্তব চাহিদার (সামাজিক প্রথাদ্বারা নির্দিষ্ট নারীর ভূমিকা এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির চাহিদা) তুলনায় তার কৌশলগত চাহিদা (নারীর অধস্তনতাকে সূচিত করে : যেমন- গৃহকর্ম ও সন্তান পালনের ভারমুক্তি, ভূমি ও সম্পদের মালিকানা, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, সমমজুরি, আইনগত অধিকার ইত্যাদি) অধিক বিবেচনা করে। কেননা দেখা গেছে যে নারীর বাস্তব চাহিদা পূরণ হলেও (কৌশলগত চাহিদা সূচিত না হলে নারীর বাস্তব চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণ হয় না) নারীর অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটে না। জেন্ডার পরিকল্পনা নারীর কৌশলগত চাহিদা আদায়ে নারীর দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। নারীর প্রতি বিরাজমান প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলে। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন ঘটায়। ফলে উন্নয়নের সুফল নারী ও পুরুষ সমভাবে ভোগ করতে পারে।

Gender Relation : জেন্ডার সম্পর্ক

নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যেভাবে একটি সমাজ বা সংস্কৃতি তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব, অধিকার বা পরিচয় নির্ণয় করে তাই হচ্ছে জেন্ডার সম্পর্ক। শ্রেণী ও বর্ণের মতই লিঙ্গীয় মতাদর্শ, লিঙ্গীয় সম্পর্ক সামাজিকভাবে নির্ধারিত ও রূপায়িত, প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত নয়। সামাজিক

সংগঠনের পরিবর্তনের সাথে সাথে লিঙ্গীয় সম্পর্কও বিকশিত হয়, পরিবর্তিত হয়। লিঙ্গীয় সম্পর্ক ও লিঙ্গীয় মতাদর্শ সামাজিক নিয়মকানুন ও অনুশীলনেরই অংশ এবং এর দ্বারা রূপায়িত, আর তাই সামাজিক জীবন সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে অবশ্যই প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে লিঙ্গীয় সম্পর্কের প্রতি। লিঙ্গীয় মতাদর্শ ও লিঙ্গীয় সম্পর্কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করে নারীর অবস্থানটি বুঝতে হবে। নারীর শ্রম, ক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যায়নকে পুরুষের শ্রম, ক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের সাথে তুলনা ব্যতীত কোনভাবেই লিঙ্গীয় সম্পর্ককে বোঝা যাবে না।

Gender Role : জেন্ডারের ভূমিকা

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা দ্বারা একজন ব্যক্তির জেন্ডার আচরণ (নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর আচরণ) প্রভাবিত হয়। এই সামাজিক সাংস্কৃতিক চাহিদাসমূহ উদ্ভূত হয়েছে যে ধারণা থেকে তা হলো- কিছু বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা নারীর জন্য স্বাভাবিক এবং কিছু বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা পুরুষের জন্য স্বাভাবিক। নারীবাদী সমাজবিদগণ দেখিয়েছেন, সামাজিক চাপে ও খাপ খাওয়ানো পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে এই সকল বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন সমাজে নারীর ভূমিকা ভিন্ন এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত আইন, ধর্মীয় কানুন, অর্থনৈতিক অবস্থান বা শ্রেণী, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, Ethnicity, সেই দেশের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের ধরন, কমিউনিটি এবং পরিবার দ্বারা। নারীরা সাধারণত গার্হস্থ্যকর্মের– যেমন সন্তানের দেখাশোনা, পারিবারিক স্বাস্থ্য, রান্না ও খাবার সরবরাহ এবং অন্যান্য পারিবারিক সেবা প্রদান-এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। বেশিরভাগ সমাজেই তারা পরিবারের উৎপাদনশীল কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে; যেমন খামার/কৃষিকাজ, গার্হস্থ্যশ্রম প্রদান, শিল্প এবং আয়মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ। কিছু সমাজে কমিউনিটিতেও তাদের খুব স্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রজনন, উৎপাদন এবং কমিউনিটি- এই তিনক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা নারীরা অনেকসময়ই বিপরীত প্রভাবের শিকার হয়। এখন পর্যন্ত নারীর নিম্নমাত্রার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা এবং উচ্চমাত্রার কিন্তু অস্বীকৃত অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যে বিপুল তফাৎ রয়েছে। বেশিরভাগ উন্নয়ন কৌশলই নারীর রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শুরু হয়।

জেন্ডার বুঝতে হলে অবশ্যই নারী ও পুরুষের কাজকে ভিন্নভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। পুরুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকাকে যেভাবে দেখা হয় তেমনিভাবেই দেখতে হবে। নারী ও পুরুষের এই ভূমিকা বিচারের মধ্য দিয়েই নির্দিষ্ট কাজ ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাদের চাহিদা ও ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে সম্পৃক্ততার বিষয়ে আরো বেশি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।

নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার ভূমিকা ও দায়িত্বের কারণে তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদাও ভিন্ন হয়। নারী এবং পুরুষ উভয়ই উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং কমিউনিটি জীবনে ভূমিকা পালন করে কিন্তু নারীর অবদান হয় কম আনুষ্ঠানিক। পুরুষের কৃষিকাজের ফল দাঁড়ায় নগদ উপার্জন; পরিবারের জন্য নারীর খাদ্য উৎপাদনের মূল্য লুক্কায়িত থাকে। কমিউনিটি জীবনে সাধারণত জনপ্রতিনিধিত্বের ভূমিকা পুরুষ গ্রহণ করে; সংগঠনে নারীর ভূমিকা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কম দৃশ্যমান, বিশেষত বহিরাগতের কাছে। উৎপাদনশীল কাজ এবং কমিউনিটি জীবনের পেছনে রয়েছে জৈবিক এবং সামাজিক পুনরুৎপাদন। মানবসমাজের ভিত্তি- শিশু ও পরিবারের যত্ন, গার্হস্থ্য পরিচর্যা, জল ও জ্বালানি সংগ্রহ, খাবার তৈরি, পরিবারের সদস্যদের বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ রাখা এবং এইসব কাজ পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ এবং চিরকালের জন্য নারীরা করবে বলেই ধরে নেয়া হয়েছে।

Gender Sensitive : জেন্ডার সংবেদী

নারী-পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক ও সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক বা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট (নারী ও পুরুষের চাহিদা, ভূমিকা, দায়িত্ব এবং অস্তিত্বপরিচয়-সংক্রান্ত) পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাকে জেন্ডার সংবেদী হওয়া বলে। নারী এবং পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে যে বিভিন্নরকমে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত হয় সে বিষয়ে সচেতনতাও জেন্ডার সংবেদনশীলতার অন্তর্ভুক্ত।

লৈঙ্গিক কারণে নিপীড়ন বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়াশীল বিষয় নয়; অন্যান্য নিপীড়নমূলক নীতি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন- বর্ণ, শ্রেণী, সংস্কৃতি, বয়স ইত্যাদি। নারী এবং পুরুষের যে সকল বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সমাজ বা সংস্কৃতি স্বাভাবিক বলে ঠিক করে দিয়েছে সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও আচরণ নিপীড়ক অর্থাৎ পুরুষ এবং নিপীড়িত অর্থাৎ নারী উভয়েই দীর্ঘকালের চর্চার ফলে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। সে কারণে নিপীড়ক ও নিপীড়িত উভয়েই এই বৈষম্যের প্রভাবক।

জেন্ডার সংবেদনশীলতার অর্থ হলো সমাজের যে জটিল বিন্যাসে আমাদের সামাজিকায়ন ঘটে তার ভেতরে সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে লৈঙ্গিক-নিপীড়ন প্রতিরোধ করা। এই প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া হলো নারীর কৌশলগত চাহিদা (Strategic need)-অনুযায়ী কাজটি করা।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রকৃতপক্ষে জেন্ডাব সচেতনতার একটি উচ্চতর ধাপ বলা যেতে পারে, যখন ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্যকে সচেতনতার সাথে পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

Gender Sensitive Appraisal : জেন্ডার সংবেদী পর্যালোচনা
প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নারী ও পুরুষের সমঅধিকার ও সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে অর্জনের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করে কি না তা যাচাই করা জেন্ডার সংবেদী পর্যালোচনার কাজ। *(বিস্তারিত ঃ জেন্ডার পরিকল্পনা, জেন্ডার অডিট)*

Gender Skill/Competencies : জেন্ডার দক্ষতা
জেন্ডার দক্ষতা বলতে একটি বিশেষ ধরনের দক্ষতাকে বোঝায়। এ দক্ষতা তৈরির প্রাথমিক ধাপগুলো হলো জেন্ডার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি ও জেন্ডার চেতনা নির্মাণ। এর মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতিভেদে জেন্ডারের বহুমাত্রিক রূপ পর্যবেক্ষণেব দক্ষতা তৈরি হয়। জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত উপলব্ধি করার মনন নির্মিত হয়। জেন্ডার দক্ষতার প্রয়োগ ঘটে উন্নয়ন পরিকল্পনায়, মূল্যায়নে, পরিবীক্ষণে। জেন্ডার চেতনা বা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্প বা পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা, নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থ ও চাহিদা বিবেচনা করতে পারা এবং উন্নয়নের সুফল নারী ও পুরুষের জন্য সমভাবে প্রাপণীয় করবার কৌশল জানাকে জেন্ডার দক্ষতা বলা যেতে পারে।

Gender Specific : লিঙ্গ নির্দিষ্ট
ভিন্ন ভিন্ন এবং সুনির্দিষ্টভাবে নারী বা পুরুষের চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনা করা। যেমন, কেবল মেয়েদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি চালু।

Gender Subordination : লৈঙ্গিক অধীনতা বা অধস্তনতা
নারী-পুরুষের অধীনতামূলক সামাজিক সম্পর্ক বা লৈঙ্গিক অধীনতা ব Gender Subordination হলো একটি সামাজিক রীতি যার ভেতর থেকে

কিছু সামাজিক বিশ্বাস গ্রহণ করে মানুষের সামাজিকায়ন ঘটে। এই সামাজিক বিশ্বাস যা ধারণ করে তা হলো- পুরুষের চেয়ে নারী নিম্নতর বা নিম্নস্তরের প্রাণী। ফলে 'পুরুষের চেয়ে নারী নিম্নতর'- এই ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ক্ষমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে (Power relation) পুরুষকে নারীর চেয়ে বেশি ক্ষমতা প্রদান করে। নারীর অধস্তন অবস্থানের কারণে তারা পুরুষ কর্তৃক শোষিত ও নিপীড়িত হয়ে থাকে।

অধস্তনতা অর্থ হল অন্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা বা অন্যের চেয়ে নিম্নতর অবস্থানে থাকা। সকল সমাজব্যবস্থায়ই নারীর অধস্তনতা একটি সাধারণ বিষয় যেখানে নারীকে পুরুষ সকল প্রকারে নিয়ন্ত্রণ করে।

১. সমাজে নারীকে যে অবস্থানে রাখা হয় তা সবসময়ই পুরুষের অবস্থানের চেয়ে নিচে এবং এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা জৈবিক পার্থক্যের তত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২. বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান– যেমন, পরিবার, উপাসনালয়, আইন, শিক্ষা, সরকার ইত্যাদি নারীকে এই অবস্থানে ধরে রাখে।
৩. সমাজের সম্পদ এবং সুবিধায় পুরুষের তুলনায় অব্যাহতভাবে নারীর গম্যতা এবং নিয়ন্ত্রণ কম।

বলা হয় নারীপুরুষের মধ্যে নারীদের অধস্তনতার কারণ ঃ

- মাতৃত্ব;
- আর্থিক নির্ভরশীলতা;
- আর্থ-সামাজিক গঠন; এবং
- মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা।

মাতৃত্ব একই সাথে যেমন একজন নারীকে সম্পৃক্ত করে একটি মানবশিশুর সাথে তেমনি তাকে বিছিন্ন করে বহির্জগত থেকে। এছাড়া সামাজিক যেসব হাতিয়ার নারীকে অধস্তন রাখার জন্য এ যাবৎ ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ধর্ম; প্রচার-মাধ্যম; আইন; এবং বিজ্ঞান।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় নারীদের সর্বজনীন অধস্তনতার ধারণাটি বিদ্যমান। নৃতত্ত্ববিদগণ তিনজোড়া দ্বন্দ্বমূলক ধারণার সঙ্গে নারীর অধস্তনতার ধারণাটিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন : প্রকৃতি-কৃষ্টি, নারী-পুরুষ, প্রাইভেট/ ব্যক্তিগত/একান্ত-পাবলিক/প্রকাশ্য/সমবায়ী। প্রকৃতির সঙ্গে নারীদের এক করে দেখা হয়,

যেহেতু তাদের শরীর প্রজাতির জীবন-উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। অপরপক্ষে, পুরুষরা চিহ্নিত হয় স্রষ্টা ও সামাজিক হিসেবে এবং তার কর্ম নির্ধারিত হয় ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রাজনীতি ও কৃষ্টি-সম্পর্কিত বিষয়াদির মধ্যে। একইভাবে নারীর গণ্ডি পরিবার হওয়ায় তা Private, অপরদিকে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র ঘরের বাইরে অর্থাৎ Public এবং তার কর্ম যুক্তিভিত্তিক। এছাড়া নারীবাদী Kate Millett পুরুষের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান পিতৃতন্ত্র এবং পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে নারীর অধস্তনতা ও নির্যাতন উৎসারিত হয় বলে মনে করেন। Christine Dephy দেখান যে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান গার্হস্থ্য-উৎপাদনপ্রণালি এবং শোষণের পিতৃতান্ত্রিক প্রণালি গঠন করে। বৈবাহিক সম্বন্ধ নারীর শ্রমশক্তির উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নারীর ভোগ ও জীবনযাপনের মান স্বামীর শ্রেণীগত অবস্থান ও আয় অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। তিনি আরও বলেন, বিবাহ-প্রতিষ্ঠান একটি শ্রমচুক্তি, যে চুক্তি বলে স্বামী তার স্ত্রীর মজুরিবিহীন শ্রম লাভ করে। স্ত্রী উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার ব্যবহারিক মূল্য ভোগ করে। লিঙ্গীয় স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্ষমতার অসম বিন্যাস এবং এর উপর ভিত্তি করে পরিবার গঠনের মধ্যেই নারীর অধস্তনতার মূল শিকড় আবদ্ধ। সংসারের ভিত্তিই হচ্ছে লিঙ্গীয় ভিন্নতা। সংসার 'চালানো' এবং 'সংসার করা' পুরুষ এবং নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। সংসার চালানোর ভূমিকাটি অর্থনৈতিক। সংসার করা আদর্শিক ও নৈতিক এবং এই নৈতিকতার আড়ালে ঢাকা পড়ে নারীর গৃহস্থালী কর্মে নিয়োগকৃত শ্রম। সংসারে বয়সে ছোট নারী/সহধর্মিনী হয় মতাদর্শগতভাবে নির্ভরশীল। স্বামী হয় তার পথপ্রদর্শক এবং পরিচালক। নারীর অধস্তন অবস্থান বিরাজমান গৃহে, গৃহের বাইরের এলাকাতে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিমণ্ডলে, কর্মসংস্থান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে।

Gender-related Development Index (GDI) : জেন্ডার সম্পর্কিত উন্নয়ন-সূচক

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এখন অন্যান্য সূচকের পাশাপাশি উন্নয়নক্ষেত্রে জেন্ডারকেও একটি সূচক হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইউএনডিপি কর্তৃক প্রতিবছর একটি মানব-উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। উন্নয়নকে পরিমাপ করা বা বোঝার ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করে সূচক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন,

একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে যদি শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয়- সেক্ষেত্রে সার্বিক শিক্ষার হারের পাশাপাশি নারী শিক্ষার হারও একটি সূচক হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও এই সূচকগ্রহণ শুরু হয়েছে।

Gendering : লিঙ্গ চেতনা নির্মাণ

নারী এবং পুরুষের জন্য সমাজ যে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ 'স্বাভাবিক' বা প্রত্যাশিত বলে ঠিক করে দিয়েছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সেই-সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ ও পালন করতে শেখে। যেমন একটি শিশুকন্যার ক্ষেত্রে পুতুল খেলাই স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে সমাজ প্রত্যাশা করে এবং একটি শিশুপুত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে শারীরিক বলপ্রদর্শনধর্মী খেলা বা দুরন্তপনা। একজন নারীর জন্য সন্তান জন্মদান বা মা হওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হিসেবে সমাজ নির্দিষ্ট করে দেয় কিন্তু একজন পুরুষের বেলায় পিতা হওয়া নয় বরং একজন কর্মবীর হওয়াই সমাজের কাছে আকাঙ্ক্ষিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন নারী বা পুরুষকে মানুষ করে তোলার পরিবর্তে ক্রমশ একজন নারী বা পুরুষ করে তোলে। এভাবেই আমরা 'পুরুষসুলভ' বা 'নারীসুলভ' আচরণ সংজ্ঞায়িত করি; আমরা শিখি, আমাদের লিঙ্গের (জৈবিক) উপযুক্ত কাজ কোনটি এবং আমাদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কী হবে। বলা যেতে পারে সামাজিকায়নের অন্যতম উপাদান লিঙ্গ চেতনা নির্মাণ।

Genderising : জেন্ডার সচেতনতা নির্মাণ

জেন্ডার সংবেদী করে তোলা বা জেন্ডার সচেতন করে তোলা। *(বিস্তারিত : জেন্ডার সচেতন, জেন্ডার সংবেদী)*

History of Gender Relation : নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস

নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক কী ছিল এবং কীভাবে এর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বা বিবর্তন ঘটেছে, তা ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়- প্রস্তরযুগে নারী এবং পুরুষের মোটামুটিভাবে সমতা ছিল। কৃষিবিপ্লবের যুগে মানুষ যখন খাদ্য উৎপাদনের কারণে স্থায়ী বসতি স্থাপন করল তখন এটি পরিবর্তিত হয়।

দুটি প্রথা এই পরিবর্তন সূচিত করে। একটি প্রথা হলো 'বিয়ে প্রথা'। কিছু কিছু গোষ্ঠীতে, এক গোষ্ঠীর পুরুষ আরেক গোষ্ঠী থেকে স্ত্রী নির্বাচন করত

এবং তারপর বসবাসের জন্য স্ত্রীকে নিজ গোত্রে নিয়ে আসত। এই গোষ্ঠীর নাম হলো 'বিবাহসূত্রে পুরুষ-কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী' বা পিতৃস্থানিক (Patrilocal) দল অর্থাৎ বিয়ের পর পুরুষের পরিবারে নারী বসবাস করবে। এই গোষ্ঠীর প্রথা হলো পুরুষ গোষ্ঠীভুক্ত হবে এবং নারী বাইরে থেকে আসবে। কিছু গোষ্ঠীর প্রথা ছিল বিবাহসূত্রে নারী-কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী বা মাতৃস্থানিক (Matrilocal) দল অর্থাৎ বিয়ের পর নারীর পরিবারে পুরুষ বসবাস করবে। এই প্রথা অনুযায়ী এই সকল গোষ্ঠীর নারীরা অন্য গোষ্ঠী থেকে স্বামী নির্বাচন করত। অপর প্রথাটি পুরুষের প্রবণতাকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। পুরুষের প্রবণতা ছিল শিকার করা ও দূরদূরান্ত সফর করা। এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটত এবং তারা নিজেদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করত; বিনিময় হতো উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির। অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিনিময় করার জন্য কৃষিজাত এই উদ্বৃত্ত দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করত নারীরা, বিবাহসূত্রে যাদের গোত্র পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত দ্রব্যের মালিক হতো বিবাহসূত্রে পুরুষ-কর্তৃত্বকারী গোত্র।

হাজার বছরে বিবাহসূত্রে পুরুষ-কর্তৃত্বকারী গোত্রসমূহ ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। এক একটি অঞ্চলে সম্পদের উপর তাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হতে থাকে। বিবাহসূত্রে পুরুষ-কর্তৃত্বকারী গোত্রসমূহে নারী অন্য গোত্র থেকে আগত বলে এর সঙ্গে তার গোত্রগত কোন সম্বন্ধ ছিল না। সে কারণে গোত্রভিত্তিক সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গোত্রগত সম্পর্ক আছে এমন নারীর অর্থাৎ কন্যার, ভগ্নীরও গোত্রসম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। কারণ বিয়ের পরে তাদের গোত্রত্যাগ করতে হতো। ধীরে ধীরে সম্পদের অধিকার থেকে সম্পর্কের প্রকৃতিও নির্ধারিত হতে থাকল।

Lesbian : সমকামী নারী

নারী নারীকে যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিলে তাকে সমকামী নারী বা লেসবিয়ান বলা যেতে পারে। কিছু সমকামী নারী নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে যে, পুরুষের সঙ্গে নির্যাতনপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রেহাই লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পুরুষের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের জন্য পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা সঙ্গী হিসেবে নারীকে বেছে নেয়া অধিক স্বস্তিকর। এই মত সমর্থকরা মনে করেন যে, নারী যদি যৌনতৃপ্তির জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী না থাকে তাহলে পুরুষের লৈঙ্গিক আধিপত্য কমে যাবে অর্থাৎ নারী লৈঙ্গিক অধীনতা থেকে মুক্তি পাবে। এই মতানুসারে, পরিবার

একটি জৈব সংগঠন যেখানে নারীকে গর্ভধারণের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুরুষাধিপত্য স্বীকার করতে হয় এবং সেই সুযোগে পুরুষ তার প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব অনিবার্য করে তোলে। তাই নারীর স্বাধীনতার জন্য পুরুষ-নির্ভরতা দূর করতে হবে। সেক্ষেত্রে নারীই নারীর সঙ্গী হতে পারে।

Male : পুরুষ

পুরুষজাতীয় প্রাণী তারাই যারা এমন এক জৈবিক গঠনের অধিকারী যে শুক্রাণু তৈরি করতে পারে। তবে পুরুষের যে ভাবমূর্তি সমাজ নির্মাণ করেছে তা নারীর চেয়ে সকলভাবে শক্তিশালী ও উন্নত মানুষের।

Male Chauvinist : পৌরুষ-অহংকারী

সেই সকল পুরুষকে পৌরুষ-অহংকারী বলা হয়ে থাকে যারা নারীকে জন্মগতভাবেই পুরুষের চেয়ে নিচু বলে বিবেচনা করে এবং যারা নারীর প্রতি কোন সম্মান পোষণ করে না।

এ বিশ্বাস থেকে স্বামী, ভাই, বাবার ভাবমূর্তি নির্মিত হয়। প্রায় জন্মের পর থেকেই পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা পুরুষ উপলব্ধি করতে থাকে। এই উপলব্ধি শৌর্য, বীর্য ও ক্ষমতার। হাজারো কষ্টে সে চোখের জল ফেলে কাঁদতে পারবে না। তাকে মা, স্ত্রী, বোনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে এবং এ দায়িত্বপালনের সফলতা তাকে গর্বিত করবে। অন্যকথায় Male Chauvinism-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপই পিতৃতন্ত্র/পুরুষতন্ত্র। কোন পুরুষ যদি পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খলের বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত হয় তাহলে সেও একঘরে হবার উপক্রম হয়। তাকে হাস্যাস্পদ করে তুলবার বহু অস্ত্র যোগান দেয় সামাজিক অধিপতি-সংস্কৃতি। যেমন- নৃত্যকলা শিল্পটি পুরুষ শিখলে তাকে কিছুটা হেয় হতে হয়, পুরুষের গলার স্বর, হাঁটা সবকিছুতেই 'পুরুষালি' ভাব থাকা জরুরি নইলে 'মিনমিনে পুরুষ' বলে অভিহিত হতে হয়। Male Chauvinism এর আগ্রাসী চরিত্রও রয়েছে। এই আগ্রাসনের সাথে রয়েছে ক্ষমতার যোগসূত্র। আগ্রাসী ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে নারী নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন, ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্রে।

Masculine : পুরুষসুলভ

বিশেষ কাল ও স্থান অনুযায়ী পুরুষের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য মানানসই হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, ধূমপান একটি পুরুষসুলভ বা পুরুষোচিত স্বভাব হিসেবে গৃহীত।

Matriarchal : মাতৃতান্ত্রিক

নৃতত্ত্বের ভাষ্য অনুযায়ী মাতৃশাসিত সমাজের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মাতৃশাসিত সমাজ পিতৃশাসিত সমাজের একটি কল্পপ্রতিরূপ। এখানে মাতৃতন্ত্র পিতৃতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত।

Matrifocal : মাতৃসম্বন্ধীয়

যে ব্যবস্থায় স্ত্রীর পরিবারে স্বামী বসবাস করে।

Matrilineal : মাতৃরৈখিক

যেখানে বংশপরম্পরা নির্ণিত হয় মায়ের দিক থেকে।

Patriarchy : পিতৃতন্ত্র

১. পিতৃতন্ত্র একটি সামাজিক নিয়ম যা গড়ে উঠেছে এই সামাজিক-ধারণা থেকে যে, পুরুষের ঔৎকর্ষই তাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে।

২. পিতৃতন্ত্র মানে 'পিতাদের ক্ষমতা' বা পিতৃত্বের অধিকার'।

৩. পুরুষের দিক থেকে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় এবং পুরুষের ইচ্ছাপূরণ করে এমন সামাজিক নিয়মকে পিতৃতন্ত্র বলে। এর অর্থ নারীর ওপরে পুরুষের অধিকারপ্রাপ্তি ও প্রয়োগের ক্ষমতা। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে নারীর শ্রমের ওপর অধিকার, নারীর শরীরের ওপর অধিকার, নারীর গর্ভধারণের ওপর অধিকার, নারীর পরিচয়ের ওপর অধিকার।

৪. এটি পুরুষ-কর্তৃত্বের একটি নীতি, যে নীতি তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নারীকে নিপীড়ন করে। পিতৃশাসিত সমাজ-সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী যাই হোক না কেন-এর সকল রীতিতেই লিঙ্গবৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে।

Position of Woman and Man : নারী-পুরুষের অবস্থান

অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থা এবং অবস্থান এই শব্দ দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও এই দুটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

অবস্থা হলো বস্তুগত। যেমন : খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, আয়-উপার্জন, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি। অবস্থার উন্নতি হলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে। তাই নারী-পুরুষের অবস্থা বলতে বোঝায় তাদের বস্তুগত অবস্থা।

অবস্থান সমাজে বা পরিবারে মানুষের (নারী ও পুরুষ) মর্যাদা, ক্ষমতা-অর্জন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। অতএব নারী বা পুরুষের অবস্থান বলতে :

- তাদের ক্ষমতা অর্জন ও তা ব্যবহার;
- নিজ পছন্দ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন;
- নিজ মতামতের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন-অনুযায়ী তা প্রতিষ্ঠা করা;
- স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অধিকার বা তার ব্যবহারের সুযোগ ও ক্ষমতা বোঝানো হয়।

নারী-পুরুষের অবস্থান জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সবসময় সম্পর্কিত নয়। তাই দেখা যায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে অবস্থানের পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে। তবে অবস্থা এবং অবস্থান কখনও কখনও পরিপূরক হতেও পারে।

Power Relations of Gender : জেন্ডার ক্ষমতার সম্পর্ক

সত্তর দশকের নারীবাদী তত্ত্বে জেন্ডার বোঝার ক্ষেত্রে ক্ষমতার সম্পর্ককে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয়। নারীর ক্ষমতা অবস্থান করে কেবল পুরুষের কর্তৃত্বের বেষ্টনীর মধ্যে।

ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সম্পর্কব্যবস্থা- তিনটিই আলাদা আলাদা সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় বলে বিবেচিত হতে পারে। আবার তিনটি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর *Power* গ্রন্থে ক্ষমতার ধরনের নানামুখী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজবিকাশের মূলসূত্রসমূহ, তাঁর কাছে মনে হয়েছে, ক্ষমতার বিবর্তনের মধ্যে নিহিত। সামাজিক গতিশীলতার সূত্র খুঁজতে গিয়ে মার্কস এবং ফ্রয়েড 'যৌনতার' ওপর জোর দিয়েছেন। আর রাসেল জোর দিয়েছেন ক্ষমতার উপর। 'ক্ষমতা' নিয়ে পরবর্তীসময় কাজ করেছেন মিশেল ফুকো। ফুকো'র মতে পরিবার, বিদ্যালয়, কারাগার, হাসপাতাল, কল-কারখানা, সেনাবারাক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে কয়েদি করে রেখেছে। তেমনি পরিবারে নারীকে পাহারা দিয়ে রেখেছে পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্র ছাড়াও ধর্ম, প্রথা, আইন-আদালত, রাষ্ট্র, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য, প্রচলিত মূল্যবোধ- এসবও নারীকে পাহারার কাজে ব্যস্ত। এমনকি আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাও নারী, পুরুষ ও সমাজকে পাহারা দিয়ে রাখছে। জিম্মি

করে রাখছে। কয়েদিতে পরিণত করছে। বর্তমান যুগে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে ভাবাদর্শ, রাষ্ট্র, আইন আদালত ইত্যাদি। তার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি হচ্ছে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অভিমত।

ফুকো আরও বলেন "সবকিছুই ক্ষমতার খেলা (Play of Forces)। ক্ষমতা জড়িয়ে আছে প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের পরতে পরতে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয় শৃঙ্খলা, তা আসলে অদৃশ্য শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু নয়। ...ক্ষমতা জ্ঞানকে বৈধতা প্রদান করে। আর বৈধ জ্ঞান ক্ষমতাকে পরিপুষ্ট করে তোলে।" তাই নারীর শৃঙ্খলও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ দ্বারা বৈধতা পায়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারক ও বাহক প্রকৃতপক্ষে পুরুষতন্ত্রই।

Rape : ধর্ষণ

সহিংসতা বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে একজন অন্যজনের ওপর শারীরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা যৌনকর্মে বাধ্য করাকে ধর্ষণ বলে। নারীবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে যে, এটি এমন একটি ক্রিয়া এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা পুরুষতান্ত্রিক প্রভুত্বকে অব্যাহত রাখে। নারীবাদী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যৌনবাদের যৌক্তিক পরিণতি হলো ধর্ষণ। পৃথিবীর সকল নারীর কাছেই নিজেদের বিপন্ন মনে করার ক্ষেত্রে 'ধর্ষণ' একটি স্থায়ী অনুস্মারক।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে নারী-নির্যাতন ও ধর্ষণের হার ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রণীত হয়েছে।**

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুসারে–

যদি কোন পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিব্যতিরেকে বা ভীতিপ্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতিব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

ধর্ষণ শব্দটি যৌনতা সংশ্লিষ্ট হলেও এর সঙ্গে যৌন আকর্ষণ জড়িত নয়। বলপ্রয়োগ করে বা সম্মতি ছাড়া নারী/পুরুষ অন্য নারী/পুরুষের ওপর নিজ যৌনতা চরিতার্থ করলে সেটিকে ধর্ষণ বলা হয়। এটি ধর্ষণের ভাষাগত

ব্যাখ্যা। বিশ্বের সকল সমাজ ও সংস্কৃতিতে পুরুষরাই এই কাজটি করে থাকে বলে ধর্ষণের সামাজিক/ব্যবহারিক অর্থ নারীর ওপর পুরুষের যৌন-নিপীড়ন। কিংবা পুরুষের ওপর পুরুষের যৌন-নিপীড়ন। বলপ্রয়োগ বা নিপীড়ন তখনই ঘটে যখন একপক্ষ আরেকপক্ষের তুলনায় সামাজিকভাবে বা ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল হয়। সকল সমাজ ও সংস্কৃতিতে পুরুষরাই 'সবল' অবস্থানে আছে বলে ধর্ষকের ভূমিকা তারাই পালন করে।

আদিম সমাজে ধর্ষণের ধারণা ছিল না। কেননা তখন নারী ও পুরুষের ক্ষমতার দ্বন্দ্বও ছিল না। মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও ধর্ষণ ছিল অনুপস্থিত (যেমন- গারো সমাজ)। কেননা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রধান নারী। প্রভুকে ধর্ষণ করা যায় না। এরকম বহু উদাহরণ আছে যে, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান-নারী তার অধস্তন পুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। তার অর্থ হলো- পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নারী হলেও (অর্থাৎ তার অবস্থা উচ্চতর) সমাজের প্রভু নয় (অর্থাৎ তার অবস্থান পুরুষের নিচে) বলে সামগ্রিকভাবে পুরুষের অধস্তন হিসেবে নারী গণ্য হয় এবং ধর্ষিত হয়।

সমাজবিবর্তনের এক পর্যায়ে পুরুষের প্রভুত্ব প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। তাকে পুরুষতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। পুরুষতন্ত্র অব্যাহত রাখার নানান পদ্ধতির একটি হলো ধর্ষণ। ধর্ষণের সঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্যের বা শরীরিক প্রভাবের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ষণের সঙ্গে যৌনলিপ্সারও কোন সম্পর্ক নেই। এটি কোন যৌন আচরণ নয়, নিপীড়নের কৌশল। নারীকে নিপীড়নের উদ্দেশ্যে পুরুষ তার হাত/পা ব্যবহার করে প্রহারের জন্য। মুখ ব্যবহার করা হয় কুৎসা রটনা ও নির্দেশ প্রদানের জন্য। মস্তিষ্ক ব্যবহার করে নারীকে দমিত রাখার প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল নির্ধারণের জন্য এবং যৌন প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে যৌন-নিপীড়নের জন্য।

নারীর আচার আচরণ, ভূমিকা, চলাচল, দৃষ্টিভঙ্গি সকল কিছুই যেমন পুরুষতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা যেমন উপেক্ষিত, তেমনি নিজ যৌনতার সার্বভৌমত্বও তার নয়। পুরুষ আগ্রাসনের সর্বশেষ পর্যায়- নারীর যৌনতা আক্রমণ- যা ধর্ষণ হিসেবে আমাদের সমাজে পরিচিত।

জেনেভা কনভেনশনে বলা হয়েছে ধর্ষণ হচ্ছে নারীর সম্মানবোধের উপরই হামলা। নারীর দৃষ্টিতে ধর্ষণ হচ্ছে নারীর প্রতি চরম সহিংসতা প্রদর্শনের

নামান্তর। এই সহিংসতা আঘাত হানে তার দেহে, তার স্বতন্ত্রতায়, তার সত্তায়, তার আত্মপরিচিতিতে, নিরাপত্তাজ্ঞানে ও মর্যাদাবোধে। নারীর উপর ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক। পাশবিক নির্যাতনের ফলে দৈহিকভাবে নারীর ক্ষতিসাধন হতে পারে : যেমন প্রবল রক্তপাত, সন্তানপ্রসবে জটিলতা, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, যৌনব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত শরীর এবং তার ফলে ভবিষ্যতে সন্তানধারণে অক্ষম হওয়া।

ধর্ষণের দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়া রয়ে যায় নারীর মনমানসে। তার মধ্যে জন্ম নেয় নিরাপত্তহীনতা, নিদ্রাহীনতা, হতাশা, ভীতি ও বিষণ্ণতা। নিজের দেহের প্রতি ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও লজ্জাবোধ জন্মাতে পারে। তার ফলে সে ভবিষ্যতে তার আত্মসম্মানবোধ, যৌনবোধ এবং সাংসারিক কাজে স্পৃহা হারিয়ে ফেলতে পারে।

Reproduction/Production : পুনরুৎপাদন/উৎপাদন

মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে এর দ্বারা উৎপাদন-প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিসম্পর্ক নির্দেশিত হয়। মার্কসীয় নারীবাদীরা নারী এবং পুনরুৎপাদনের তিনটি সংজ্ঞা প্রদান করে ঃ

১. প্রজাতির জৈবিক পুনরুৎপাদন (জন্মদান);
২. পুঁজিবাদের স্বার্থে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন (গৃহকর্ম ও শিশুপালন); ও
৩. নিয়ন্ত্রণমূলক চিন্তাধারা বা আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পুনরুৎপাদন।

Sex : লিঙ্গ/যৌন

জেন্ডারের ধারণা বোঝার জন্য সেক্স বিষয়টি অনুধাবন করা বিশেষ জরুরি। কারণ সাধারণভাবে জেন্ডার ও সেক্স এই শব্দ দুটি সমার্থক হিসেবে প্রচলিত। ফলে জেন্ডারের ধারণার সঙ্গে এর পার্থক্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সেক্স হলো নারী ও পুরুষের সর্বজনীন, অবশ্যম্ভাবী ও স্থায়ী জৈবিক/শারীরিক পার্থক্যের স্মারক। এই শব্দটির দ্বারা যৌনমিলন বা যৌনকর্মও বোঝানো হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির পুরুষ বা নারী লৈঙ্গিকসত্তা নির্ধারিত হয় তার জৈবিক ও শারীরকাঠামো অনুযায়ী। ব্যক্তির লৈঙ্গিক-সত্তার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

১. বাহ্যিক যৌনপ্রত্যঙ্গ;
২. অভ্যন্তরীণ যৌনপ্রত্যঙ্গ;

৩. বয়ঃসন্ধিকালে দ্বিতীয় পর্যায়ের যৌন-লক্ষণের উন্নতি (স্তন বা শ্মশ্রু ইত্যাদি)।

যৌনসম্পর্ক পারস্পরিক ভালবাসার ব্যাপার, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ব্যাপার। পারস্পরিক সম্মতি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনরকম বলপ্রয়োগ, ফাঁকি বা প্রতারণা থাকলে তা আর মানবিক যৌনসম্পর্ক থাকে না।

যৌনতা একটি প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি। যৌনসুখলাভ মানুষের অধিকারও বটে। সন্তান জন্মদান যৌনতৃপ্তিলাভের মতো প্রত্যক্ষ বাসনা নয়, বরং একটি জৈবিক পরিণাম। বলা হয়ে থাকে মাতৃত্বলাভই নারীত্বের চূড়ান্ত সাফল্য। এটাও এক ধরনের জনপ্রিয় মিথ। বংশবৃদ্ধির বাসনা একটি উদ্দেশ্য, অন্যদিকে যৌনতৃপ্তিলাভ একটা সহজাত আকাঙ্খা। প্রথমটি ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, পরেরটি অনিবার্য চাওয়া। যৌনতৃপ্তি ছাড়াও নারী মাতৃত্ব লাভ করতে পারে।

মানুষের যৌনচেতনা, যৌনক্ষমতা, যৌন-অংশীদারিত্ব ইত্যাদি জৈবিক প্রবৃত্তি হলেও এর বিকাশ-প্রকাশের ওপর সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে। বহুলাংশেই মানুষের যৌনভাবনা গড়ে ওঠে তার সার্বিক সাংস্কৃতিক অর্জনকে নির্ভর করে। তা কখনও নিয়ন্ত্রিত থাকে, কখনো হয় অবদমিত। নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কিছু বিধিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, আর অবদমন হচ্ছে চাপিয়ে দেয়া অযৌক্তিক ব্যবস্থা।

ফ্রয়েডের মতো আধুনিক মনোবিদও বলেছেন, নারী যৌনক্রিয়ায় passive এবং পুরুষ active, যা সঠিক নয়। সিমোন দ্য বোভোয়ার ভাষায় 'তাকে পরাভূত করা হয়, সম্মত হতে বাধ্য করা হয়, জয় করা হয়। নারী থাকে পরাজয়ের ভঙ্গিতে... পুরুষটি তার উপর চাবুক হাতে এমন অবস্থান নেয় যেন সে কোন পশুর উপর চড়ে বসে।' এটাই হচ্ছে পুরুষের আধিপত্যের নমুনা। আধুনিক নারীবাদীরা যৌনক্ষেত্রে এ আধিপত্যের অবসান চান।

বাংলাদেশের সমাজে যৌনতা নিয়ে স্বাভাবিক আলোচনা বা বিতর্কের পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠে নি। নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক সাধারণভাবে 'কুকাজ' হিসেবে অভিহিত হয়, এ সম্পর্কিত কথা অভিহিত হয় 'খারাপ কথা' হিসেবে। যৌনজীবন সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গি একদিনের নয়। এটি এদেশিয় বহু বছরের গড়ে ওঠা 'সংস্কৃতি', ধর্ম যাকে উপর্যুপরি উৎসাহিত করেছে।

Sexism : যৌনবাদ

মানুষ যখন গতানুগতিক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে কেবল সুনির্দিষ্ট লিঙ্গের কারণে কোন মানুষের ওপর রক্ষণশীল সংস্কার প্রয়োগ করে বা বৈষম্য তৈরি করে তখন তাকে যৌনবাদ বলে। এটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় নারীর প্রতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, যে দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ নারীকে হেয় করে বা অনৈতিক/অনুচিতভাবে পিছিয়ে দেয়।

Sexual Division of Labour : শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন

কাজ বা শ্রমবিভাজন ব্যক্তির লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বরং অনেক বেশি সংস্কৃতি- নিয়ন্ত্রিত। নারী অথবা পুরুষের মধ্যে কাজটি কে করছে, তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় কাজটির মজুরি এবং মূল্যায়ন। বিশ্বব্যাপী নারীবাদীদের মতে কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক এই বিভাজনের ফলে বিশ্ব-অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ শোষিত হচ্ছে নারী। সমাজে লিঙ্গভেদে শ্রমবিভাজনের ব্যাপারটি জেন্ডারের দ্বারাই ভাল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু প্রজননের ব্যাপারটি নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেজন্য সমাজও কর্মবিভাজনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। এছাড়া নির্দিষ্ট সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাও এক্ষেত্রে কাজ করে।

Sexual Harassment : যৌন হয়রানি

দু'জন মানুষের মধ্যকার যৌন আকর্ষণের ব্যাপার এখানে অনুপস্থিত। এটা একধরনের অযাচিত যৌন মনোযোগ যা একজনের কাছে অনভিপ্রেত। এর মধ্যে যৌন সহানুভূতি বা আনুকূল্যের অনুরোধ, অনাকাঙ্ক্ষিত বা হেয়কারী মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি, স্পর্শ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

যৌন বিষয়টি যে মানবিক আকর্ষণীয় আনন্দময়, এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অরুচি, স্বাধীনতা থাকে। যৌনাচার একটি বিশুদ্ধ মানবিক শিল্প (Art)। অপরপক্ষে Sexual Harassment বা যৌন হয়রানি, প্রকৃতঅর্থে নারীনির্যাতনের (Women's oppression) ব্যাপকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিপীড়ন দুইভাবে হতে পারে- দৈহিক ও অদৈহিক এবং বলপ্রয়োগ ও সম্মতিসাপেক্ষে। পরেরটি সম্ভব হয় বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে, আইনগত ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের মাধ্যমে সেগুলোকে রাষ্ট্র সমর্থন ও পোষণ করে।

যৌন হয়রানির সঙ্গে নারীর সম্পর্ককে আলাদা করে ভাবা যায় না। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও নেতিবাচক বিরাজমান আচরণ ছোটবেলা থেকেই শিশুর মনে প্রতিফলিত হয়। নারীপুরুষ সম্পর্ক নিয়ে যে প্রচলিত চিন্তাধারা রয়েছে, তার সাথে দৈহিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বল যুক্ত হয়েই ধর্ষণের মত ঘৃণ্য অপরাধ ঘটে। আমাদের সামাজিক রীতি ও সাংস্কৃতিক চর্চায় আগ্রাসীধর্মী যৌনতার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। পুরুষের অনভিপ্রেত যৌন-আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা হয় এমন কি কোন নারী যৌন হয়রানির ব্যাপারে অভিযোগ করলে তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

১৯৯৫-এ বেইজিং সম্মেলনেই প্রথম দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষিত হলো যে ধর্ষণ একটি যুদ্ধাপরাধ। সনাতনভাবে ধর্ষণ সংজ্ঞায়িত হয় নারীর ইজ্জতহরণ হিসেবে। এখানে নারীবাদীরা বলে, ধর্ষণ প্রকৃতপক্ষে নারীর দেহ ও মনের উপর হামলা। তার মাধ্যমে সে লাঞ্ছিত হয় শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে। নারীর দেহ ও মনে ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী।

অধিপতিশীল সমাজব্যবস্থায় অনেক কিছুই সহজে বলা যায় না। আর এই বলা না যাওয়া বা না বলা এর মধ্যেই বৈধতা পায় সামাজিক মতাদর্শ। এরই অনুশীলিত এবং চর্চিত রূপ হিসেবে নারী কখনই প্রকাশ করে না তার যৌন হয়রানির কথা। একভাবে বলা যায় 'ব্যক্তিগত' বিষয়ের মোড়কে একে আবদ্ধ করা হয়। নারীর অভিজ্ঞতাকে কখনও রাজনৈতিক হয়ে উঠতে দেয়া হয় না। সমাজের গঠনপ্রক্রিয়ায় ও ক্ষমতার স্তরবিন্যাসে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভিন্নভাবে নির্মিত। তার প্রকাশ ঘটে সাংস্কৃতিক প্রতীকী রূপদানের মাধ্যমে। এই সামাজিক নির্মাণ অনিবার্যভাবে নারীপুরুষের ক্ষমতা-আধিপত্যের ভিত্তিতে ব্যবধান সৃষ্টি করে, ফলে দেখা যায় প্রতিদিন নানা ধরনের যৌন হয়রানিতে আক্রান্ত হয় নারী। নারীর সত্তা, তার স্বাতন্ত্র্য, তার দেহ, আত্মপরিচিতি, নিরাপত্তাজ্ঞান, মর্যাদাবোধ প্রভৃতিতে আঘাত করা হয় নানা ধরনের যৌন হয়রানির মাধ্যমে। নারীকে সর্বদা বিচলিত থাকতে হয় তার অস্তিত্ব নিয়ে। তার শরীর নিয়ে। নারীর যৌন হয়রানিমূলক অভিজ্ঞতাকে সবসময় ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলে। তাই ধর্ষণের প্রতিশব্দ করা হয় লাঞ্ছনা বা সম্ভ্রমহানি।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এ **Sexual Harassment** সম্পর্কে বলা হয়েছে

১. *কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌনকামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*

২. *কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌনকামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারীর শ্লীলতাহানি করিলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করিলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।*

Socialization Process : সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

এককথায় বলা যেতে পারে যে মানুষ তা-ই করতে শেখে সমাজ তার ওপর যা অর্পণ করে। জন্ম থেকেই ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার ভূমিকা মেনে নেয়ার মধ্য দিয়েই নারী ও পুরুষের সামাজিকায়ন ঘটতে থাকে। বেশিরভাগ সমাজেই সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো নারী ও পুরুষের কাছে ভিন্ন ভূমিকা ও প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠা করা।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট সমাজের নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই সকলে জেন্ডারের ধারণা পায়। অনেক সংস্কৃতিতেই পুরুষালি আচরণ প্রদর্শনের জন্য বালকদের উৎসাহিত করা হয় (বিপরীতার্থে বালিকাদেরও))। ভিন্ন ধরনের খেলনা (বালকদের জন্য বন্দুক, বালিকাদের জন্য পুতুল) সরবরাহ করা হয়। ভবিষ্যতে তারা যে ধরনের কাজ করবে বলে সমাজ প্রত্যাশা করে গণমাধ্যমেও তারই প্রতিফলন থাকে। শিশুরা জন্ম থেকেই জেন্ডার-ভূমিকা আত্মস্থ করতে শুরু করে। নারী বা পুরুষ হিসেবে তারা কীরকম ব্যবহার করবে অন্যেরা কী চায় বা কীভাবে দেখে, সেই অনুযায়ী তারা স্থির করতে শেখে। সারাজীবন ধরে তাদের অভিভাবক, শিক্ষক, সঙ্গী, সমাজ এবং সংস্কৃতির দ্বারা এইসব বোধ আরো বদ্ধমূল হতে থাকে।

আমরা কী শিখি তা নির্ভর করে যে সমাজে আমরা জন্ম নিই, যেখানে আমাদের অবস্থান, আমাদের দারিদ্র অথবা বিত্ত এবং আমাদের সম্প্রদায়গত অবস্থানের ওপর। কিছু সমাজে নারীরা নিজে কৃষক/কৃষিজীবী, নিজে ষাঁড়ের

মালিক, নিজে জমি চাষ করে। কিন্তু সমাজে এসব কাজ প্রকৃতি ও ঈশ্বরদত্ত। আবার কিছু ক্ষেত্রে- যেখানে যুদ্ধ, অভিবাসন ইত্যাদি রয়েছে- সেক্ষেত্রে নারীকে সম্পূর্ণভাবে গৃহের দায়িত্ব নিতে হয় এবং সেখানে পরিবারকে সকল কিছু জোগান দেয়ার জন্য উৎপাদন যন্ত্রের ওপর নারীর অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। অতএব জেন্ডারের ভূমিকা কেবল ভিন্নই নয় সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। বলা যেতে পারে লিঙ্গচেতনা নির্মাণ বা Gendering সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ উপাদান

Son Preference : পুত্র-প্রাধান্য

নারীদের অধঃস্তন অবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে পুত্রসন্তান লাভের আশায়, যা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে Sex-ratio-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কন্যাসন্তান যৌতুক হিসেবে পরিবারের সম্পদ নিয়ে বাড়ি ছাড়ে, অপরপক্ষে 'বংশের বাতি' ছেলে পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে ভবিষ্যতে। যে নারী পুত্রসন্তান প্রসব করে, পরিবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; একইভাবে কন্যাসন্তানের প্রসব তাকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেয়। একটি গবেষণায় দেখা যায় পুত্রসন্তান কন্যাসন্তানের চেয়ে বেশি দিন বুকের দুধ খায়, অসুস্থ হলে ছেলেটিকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নেয়া হয়। ভারতের কেরালা ও তামিলনাড়ুতে ভ্রূণ সনাক্তকরণে মেয়ে চিহ্নিত হলে বিনষ্টও করা হয়। এটি সমাজের কাঠামোগত সমস্যা। কারণ আইনি উত্তরাধিকার (সম্পত্তির ক্ষেত্রে) এবং সমাজের মূল্যবোধ পুত্রসন্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তাই লোকসমাজে পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হবে এটাই স্বাভাবিক।

Stereotyping : গতানুগতিকতা

সংস্কার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে নারী বা পুরুষকে প্রচলিত বা গতানুগতিক কতকগুলি ভূমিকায় দেখা ও সেই অনুযায়ী আচরণ করা। যেমন; নারীরা সেবামূলক কাজে বেশি দক্ষতা প্রদর্শন করে অথবা পুরুষেরা সিদ্ধান্ত নেয়, ইত্যাদি *(বিস্তারিত : জেন্ডার ও যোগাযোগ এবং দেহ ভাবমূর্তি)*

Violence Against Women : নারীর প্রতি সন্ত্রাস

নারীকে পুরুষ তার সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচনা করে এবং ফলে ঘটতে থাকে নানা ধরনের নিপীড়ন বা সন্ত্রাস। নারীর প্রতি এই সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে যৌন হয়রানি, যৌনপীড়ন, ধর্ষণ, ব্যভিচার, শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি।

শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও নারীর প্রতি সন্ত্রাসের নানা চেহারা আছে। কর্মক্ষেত্রে যখন পুরুষ নিয়োগকর্তা তার সহকর্মী নারীর পদোন্নতি বা ন্যায়সঙ্গত আচরণের বিনিময়ে তার যৌন আনুকূল্য আশা করে এবং প্রত্যাখ্যাত হয় তখন নারী নানান হেনস্থার মাধ্যমে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। পথেঘাটেও নারী মৌখিক ও শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়, ধর্ষিত হয়। গল্প এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে (গণমাধ্যমে সংবাদপত্রে, টিভি, রেডিও) নারী অপমানিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে পুরুষেরা প্রায়ই ধর্ষণের দিকে ঝুঁকে পড়ে- এই জন্য নয় যে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়; বরং সমাজ, বিশেষত, নারীর প্রতি একধরনের হতাশা ও রাগ থেকে এর সৃষ্টি। যেসব পুরুষ মনে করে সমাজে তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে, যারা বেকার, নিজেদের প্রয়োজনহীন এবং অযোগ্য মনে করে, এরাই নিজেদের ক্ষোভমুক্তির পথ হিসেবে অপরাধ ও সন্ত্রাসকে বেছে নেয়। এবং যে কোন আক্রমণের জন্য নারী সহজতম শিকার। এভাবেই পুরুষের আগ্রাসনের/লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নারী।

Women and Development (WAD) : নারী ও উন্নয়ন

পঞ্চাশের দশক থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অবদান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে সবসময়ই অর্থনীতির সক্রিয় নিয়ামক বিবেচনা করা হয় এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যকার সম্পর্কটি বিবেচনা করা হয় না। যেমন একজন নারী সরাসরি অর্থনৈতিক উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরিবারে বিশেষ আর্থিক অবদান রাখলেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে তার নিজস্ব উপার্জিত অর্থের ওপরেও তার স্বনিয়ন্ত্রণ থাকে না। WAD দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমস্যা বিবেচনায় রাখা হয় না। *(বিস্তারিত : জেন্ডার ও উন্নয়নের ইতিহাস)।*

Women in Development (WID) : উন্নয়নে নারী

এই দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রক্রিয়ায় নারীকে প্রকল্পের একজন নিষ্ক্রিয় সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেই অবস্থান থেকেই তাকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবা হয়। *(বিস্তারিত : জেন্ডার ও উন্নয়নের ইতিহাস)*